অন্ত্য-লীলা

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ

বন্দে তং কৃষ্ণচৈতন্যং মাতৃভক্তশিরোমণিম্।
প্রলপ্য মুখসঙ্ঘর্ষী মধূদ্যানে ললাস যঃ॥ ১

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ॥ ১

এইমতে মহাপ্রভু কৃষ্ণপ্রেমাবেশে।
উন্মাদ প্রলাপ করে রাত্রি দিবসে॥ ২

প্রভুর অত্যন্ত প্রিয় পণ্ডিত জগদানন্দ।
যাহার চরিত্রে প্রভু পায়েন আনন্দ॥ ৩

প্রতিবৎসর প্রভু তাঁরে পাঠান নদীয়াতে।
বিচ্ছেদদুঃখিতা জানি জননী আশ্বাসিতে—॥ ৪

“নদীয়া চলহ, মাতাকে কহিয় নমস্কার।
আমার নামে পাদপদ্ম ধরিহ তাঁহার॥ ৫

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

মাতৃভক্তশিরোমণিং মাতৃভক্তানাং শিরোভূষণং শ্রেষ্ঠমিত্যর্থঃ। মধূদ্যানে বৈশাখীপূর্ণিমায়াং জগন্নাথবল্লভনাম-কৃত্রিমবনে ললাস বিহরিতবান্। চক্রবর্ত্তী। ১

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

অন্ত্যলীলার এই ঊনবিংশ পরিচ্ছেদে শ্রীমন্মহাপ্রভুর মাতৃভক্তি এবং দিব্যোন্মাদ-প্রলাপ, গম্ভীরার ভিত্তিতে মুখ-সংঘর্ষণ এবং শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গগন্ধ-স্ফূর্ত্তিতে প্রভুর দিব্যনৃত্যাদি বর্ণিত হইয়াছে।

শ্লো। ১। অন্বয়। মাতৃভক্তশিরোমণিং (মাতৃভক্ত-শিরোমণি) তং কৃষ্ণচৈতন্যং (সেই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-চন্দ্রকে) বন্দে (আমি বন্দনা করি) মুখসংঘর্ষী (ভিত্তিতে মুখ-সংঘর্ষণকারী) যঃ (যিনি) প্রলপ্য (প্রলাপ করিয়া) মধূদ্যানে (বসন্তকালে বনে) ললাস (বিহার করিয়াছিলেন)।

অনুবাদ। আমি সেই মাতৃভক্ত-শিরোমণি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-চন্দ্রকে বন্দনা করি, যিনি ভিত্তিতে মুখ-সংঘর্ষণ করিয়াছিলেন এবং প্রলাপ করিয়া বসন্তকালে বনে বিহার করিয়াছিলেন। ১

মাতৃভক্তশিরোমণিম্—মাতৃভক্তদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। **মধূদ্যানে**—মধুকালে (বসন্তকালে—বৈশাখীপূর্ণিমায়) উদ্যানে (জগন্নাথবল্লভ নামক কৃত্রিম উপবনে)।

এই শ্লোকে এই পরিচ্ছেদে বর্ণিত বিষয়ের উল্লেখ করা হইয়াছে।

২। **উন্মাদ প্রলাপ**—দিব্যোন্মাদবশতঃ প্রলাপ।

৪। **বিচ্ছেদ-দুঃখিতা**—পুত্রবিচ্ছেদ-দুঃখিতা (শচীমাতা)। **জননী**—শচীমাতাকে। **আশ্বাসিতে**—প্রভুর বার্ত্তা বলিয়া আশ্বস্ত করিতে।

৫। ছয় পয়ারে, শচীমাতার নিকট জগদানন্দ পণ্ডিতকে কি কি বলিতে হইবে, প্রভু তাহা উপদেশ করিতেছেন।

কহিয় তাঁহারে—তুমি করহ স্মরণ।
নিত্য আসি আমি তোমার বন্দিয়ে চরণ ॥ ৬
যে দিনে তোমার ইচ্ছা করাইতে ভোজন।
সেই দিনে আসি অবশ্য করিয়ে ভক্ষণ ॥ ৭
তোমার সেবা ছাড়ি আমি করিল সন্ন্যাস।
বাতুল হইয়া আমি কৈল ধর্ম্মনাশ ॥ ৮
এই অপরাধ তুমি না লইহ আমার।
তোমার অধীন আমি—পুত্র তোমার ॥ ৯
নীলাচলে আছি আমি তোমার আজ্ঞাতে।
যাবৎ জীব' তাবৎ আমি নারিব ছাড়িতে ॥” ১০
গোপলীলায় পায়ে যেই প্রসাদ বসনে।
মাতাকে পাঠায়ে তাহা পুরীর বচনে ॥ ১১
জগন্নাথের উত্তম প্রসাদ আনাঞা যতনে।
মাতাকে পৃথক্ পাঠায় আর ভক্তগণে ॥ ১২
মাতৃভক্তগণের প্রভু হয়ে শিরোমণি।
সন্ন্যাস করিয়া সদা সেবেন জননী ॥ ১৩
জগদানন্দ নদীয়া গিয়া মাতারে মিলিলা।
প্রভুর যত নিবেদন সকলি কহিলা ॥ ১৪

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

“পণ্ডিত, তুমি নদীয়ায় যাও ; যাইয়া মাকে আমার নমস্কার জানাইবে ; আমার নামে (আমার প্রতিনিধিরূপে) তুমি মায়ের পাদপদ্ম ধরিয়া নমস্কার করিবে।”

৬। “মাকে বলিও, তিনি আমাকে নিত্যই স্মরণ করেন, তাহা আমি জানিতে পারি ; আমিও নিত্যই যাইয়া মায়ের চরণ বন্দন করিয়া থাকি।” আবির্ভাবে প্রভু নদীয়াতে নিত্য মায়ের চরণ বন্দন করিতেন।

৭। “আরও বলিও, যেদিন তিনি আমাকে কিছু খাওয়াইতে ইচ্ছা করেন, আমিও সেইদিন যাইয়া তাঁহার প্রদত্ত দ্রব্য খাইয়া থাকি।” এস্থলেও প্রভু আবির্ভাবেই যাইতেন।

৮। আর বলিও, “মায়ের সেবা ছাড়িয়া আমি সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছি ; ইহা আমার পক্ষে পাগলের কাজই হইয়াছে। ধর্ম্মের নিমিত্ত আমি সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছি, তদ্দ্বারা আমি আমার ধর্ম্ম নষ্টই করিয়াছি ; কারণ, মাতৃসেবা ছাড়িয়া কেহ ধর্ম্মলাভ করিতে পারেনা।”

বাতুল—বাউল, পাগল ; হিতাহিত-জ্ঞানশূন্য।

৯। “মায়ের চরণে আমার প্রার্থনা জানাইও, তিনি যেন তাঁহার এই অবোধ ছেলের অপরাধ—মাতৃসেবা-ত্যাগজনিত অপরাধ—ক্ষমা করেন। যদিও আমি সন্ন্যাসী হইয়া তাঁহার চরণ হইতে দূরে রহিয়াছি, তথাপি আমি তাঁহারই অধীন ; যেহেতু আমি তাঁহার পুত্র ; সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছি বলিয়া আমাদের সম্বন্ধ ছিন্ন হয় নাই ; তিনি যেন কৃপা করিয়া নিজগুণে আমার অপরাধ ক্ষমা করেন, ইহাই তাঁহার চরণে প্রার্থনা।”

১০। “আমি মায়ের অধীন বলিয়াই, মায়ের আদেশে নীলাচলে বাস করিতেছি ; মায়ের আদেশ আমি লঙ্ঘন করিতে পারিনা ; তাই যতদিন বাঁচিয়া থাকিব, ততদিন নীলাচল ছাড়িয়া যাইতে পারি না।”

১১। **গোপলীলায়**—শ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমী-উপলক্ষ্যে প্রভু গোপবেশ ধারণ করিয়া নৃত্যাদি করিতেন। প্রভুর এই লীলাকেই এস্থলে গোপলীলা বলা হইয়াছে। **প্রসাদ বসনে**—শ্রীজগন্নাথের প্রসাদীবস্ত্র। অথবা শ্রীজগন্নাথের মহাপ্রসাদ ও প্রসাদীবস্ত্র। গোপবেশে নৃত্য-উপলক্ষ্যে শ্রীজগন্নাথের সেবকগণ প্রভুকে মহাপ্রসাদ ও প্রসাদীবস্ত্র দিতেন। **পুরীর বচনে**—শ্রীপাদ পরমানন্দ-পুরীর আদেশে। গোপলীলায় প্রতি বৎসরই প্রভু মহাপ্রসাদ ও প্রসাদীবস্ত্র পাইতেন ; শ্রীপাদ পরমানন্দপুরীর আদেশে প্রতি বৎসরই তাহা প্রভু মাতার নিকটে পাঠাইতেন।

১২। গোপলীলায় প্রাপ্ত মহাপ্রসাদ ব্যতীত, আরও উত্তম উত্তম মহাপ্রসাদ আনাইয়া, মাতার জন্য এবং গৌড়ের ভক্তগণের জন্য পৃথক্ পৃথক্ ভাবে পাঠাইতেন।

আচার্য্যাদি ভক্তগণে মিলিলা প্রসাদ দিয়া।
মাতা-ঠাঞি আজ্ঞা লৈল মাসেক রহিয়া ॥ ১৫
আচার্য্যের ঠাঞি গিয়া আজ্ঞা মাগিল।
আচার্য্যগোসাঞি প্রভুকে সন্দেশ কহিল ॥ ১৬
তর্জ্জা প্রহেলী আচার্য্য কহে ঠারে ঠোরে।
প্রভুমাত্র বুঝে, কেহো বুঝিতে না পারে ॥ ১৭
"প্রভুকে কহিয় আমার কোটি নমস্কার।
এই নিবেদন তাঁর চরণে আমার—॥ ১৮
বাউলকে কহিয়—লোকে হইল বাউল।
বাউলকে কহিয়—হাটে না বিকায় চাউল ॥ ১৯
বাউলকে কহিয়—কাজে নাহিক আউল।
বাউলকে কহিয়—ইহা কহিয়াছে বাউল ॥" ২০

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

১৫। **আচার্য্যাদি**—শ্রীঅদ্বৈত-আচার্য্য প্রভৃতি। **প্রসাদ দিয়া**—মহাপ্রভুর প্রেরিত মহাপ্রসাদ দিয়া। **মাতা ঠাঞি**—শচীমাতার নিকটে। **আজ্ঞা**—নীলাচলে ফিরিয়া যাওয়ার অনুমতি।

জগদানন্দ একমাস নদীয়ায় রহিলেন; তারপর নীলাচলে ফিরিয়া যাইবার জন্য শচীমাতার আদেশ লইলেন।

১৬। **আচার্য্যের ঠাঞি**—অদ্বৈত আচার্য্যের নিকটে। **আজ্ঞা মাগিল**—নীলাচলে ফিরিয়া যাওয়ার অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। **সন্দেশ**—বার্ত্তা, সংবাদ।

মহাপ্রভুর নিকটে বলিবার নিমিত্ত শ্রীমদদ্বৈতাচার্য্য জগদানন্দ-পণ্ডিতের নিকটে একটা সংবাদ বলিলেন। এই সংবাদটী একটা তর্জ্জার আকারে বলা হইয়াছিল।

১৭। **তর্জ্জা প্রহেলী**—তর্জ্জা ও প্রহেলী প্রায় একার্থবোধক শব্দ। এস্থলে বোধ হয়, "তর্জ্জা"-শব্দ "ভঙ্গীযুক্ত বাক্য"-অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। তর্জ্জা প্রহেলী—ভঙ্গীযুক্ত-বাক্যময়ী প্রহেলিকা।

প্রহেলী—প্রহেলিকা, হেয়ালী; যাহাতে উদ্দিষ্ট অর্থ-গোপনের উদ্দেশ্যে এমন কতকগুলি শব্দ বা বাক্য ব্যবহৃত হয় যে, তাহাদের যথাশ্রুত অর্থ এক রকম হয়, আর আসল অর্থ অন্যরূপ হয়, তাহাকে প্রহেলিকা বলে। "বক্তীকৃত্য কমপ্যর্থং স্বরূপার্থস্য গোপনাৎ। যত্র বাহ্যান্তরাবর্থৌ কথ্যতে সা প্রহেলিকা।"

ঠারে ঠোরে—ইঙ্গিতে।

প্রভুর নিমিত্ত আচার্য্য যে সংবাদটী পাঠাইলেন, তাহা প্রহেলিকার (হেয়ালীর) আকারে ইঙ্গিতে পাঠাইলেন; সুতরাং তাহা জগদানন্দ বুঝিতে পারিলেন না, অন্য কেহও বুঝিতে পারিল না; একমাত্র প্রভুই ইহার অর্থ বুঝিতে পারিবেন।

পরবর্ত্তী "বাউলকে কহিয়" ইত্যাদি দুই পয়ারে প্রহেলিকা (বা তর্জ্জাটী) ব্যক্ত হইয়াছে।

১৮। আচার্য্য জগদানন্দকে বলিলেন—"প্রভুকে আমার কোটি কোটি নমস্কার জানাইবে; আর তাঁর চরণে আমার একটী নিবেদন আছে, তাহাও জানাইবে।" এই নিবেদনটী পরবর্ত্তী দুই পয়ারে তর্জ্জায় বলা হইয়াছে।

১৯-২০। "বাউলকে কহিয়" হইতে "ইহা কহিয়াছে বাউল" পর্য্যন্ত দুই পয়ারে আচার্য্যের তর্জ্জা। তর্জ্জার যথাশ্রুত অর্থ (বা অন্বয়) এইরূপ:—"জগদানন্দ! বাউলকে বলিও, লোক বাউল হইল। বাউলকে বলিও, হাটে চাউল বিকায় না। বাউলকে বলিও, কাজে আউল নাই। বাউলকে কহিও, ইহা বাউলে কহিয়াছে।" মোটামোটী সংবাদটী হইল এই যে—"লোকে বাউল হইয়াছে, হাটে আর চাউল বিকায় না, কাজেও আর আউল নাই।"

এই তর্জ্জার গূঢ় অর্থ কি, তাহাই বিবেচ্য।

বাউলকে—বাতুলকে, উন্মত্তকে; কৃষ্ণপ্রেমোন্মত্ত শ্রীমন্মহাপ্রভুকে।

লোকে হইল বাউল—সমস্ত লোক প্রেমোন্মত্ত হইয়াছে।

হাটে না বিকায় চাউল—প্রত্যেক লোকের ঘরেই যখন যথেষ্ট চাউল থাকে, সুতরাং যখন কাহারও আর চাউলের অভাব থাকে না, তখনই হাটে চাউল বিক্রয় হয় না; চাউলের দোকানদারকে অনর্থক চাউল লইয়া

এত শুনি জগদানন্দ হাসিতে লাগিলা।
নীলাচলে আসি তবে প্রভুকে কহিলা॥ ২১

তর্জ্জা শুনি মহাপ্রভু ঈষৎ হাসিলা।
'তাঁর যেই আজ্ঞা' বলি মৌন করিলা॥ ২২

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

হাটে বসিয়া থাকিতে হয়। শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রেমের হাটে প্রেমরূপ-চাউলের দোকানদার ছিলেন শ্রীঅদ্বৈতাদি। হাটের মালিক শ্রীমন্মহাপ্রভুর আদেশে তাঁহারা যাকে তাকে প্রেমরূপ-চাউল বিতরণ করিয়াছেন। এইরূপে সকল লোকেই যথেষ্ট পরিমাণে প্রেম পাইয়াছে, সকলেই প্রেমোন্মত্ত হইয়াছে ; বাকী আর কেউ নাই ; তাই, এখন গ্রাহক-অভাবে প্রেমের হাটে আর প্রেমরূপ চাউল বিক্রয় হয় না ; দোকানদারদিগকে অনর্থক বসিয়া থাকিতে হয়।

প্রেমকে চাউল বলার হেতু এই যে, চাউল যেমন লোকের দেহ-ধারণের এবং দেহপুষ্টির একমাত্র উপকরণ, তদ্রূপ প্রেমও জীবের স্বরূপে স্থিতির এবং স্বরূপানুবন্ধি কার্য্য করিবার পক্ষে একমাত্র উপকরণ ও সহায়।

আউল— আকুল, আকুলতা, ব্যস্ততা।

পূর্ব্ববঙ্গের কথ্য ভাষায় অনেক স্থলে শব্দের মধ্যবর্ত্তী "ক্" লোপ পাইতে দেখা যায়। এখনও অনেক স্থলে "দোকান"কে "দোয়ান", "শিকড়"কে "শিয়ড়", "রকম"কে "র-অম—এ কি র-অম্ কথা", "নিকাল"কে "নিয়াল—গরুটা নিয়াল (বাহির কর)" ইত্যাদি বলিতে শুনা যায়। সম্ভবতঃ, এই ভাবেই "আকুল" শব্দ "আউলে" পরিণত হইয়াছে।

কাজে নাহিক আউল—কাজে আর ব্যস্ততা নাই। হাটে কেহই চাউল কিনিতে আসে না বলিয়া চাউল বিক্রয়ের জন্য দোকানদারদেরও আর ব্যস্ততা নাই, তাহাদিগকে চুপ্ চাপ্ করিয়াই বসিয়া থাকিতে হয়। গূঢ়ার্থ এই যে, সকল লোকই প্রেমোন্মত্ত হওয়ায় প্রেম বিতরণ-কার্য্যের আর প্রয়োজন নাই ; তাই, যাহাদের উপর প্রেম বিতরণের ভার ছিল, তাহাদের আর কার্য্য-ব্যস্ততা নাই, সকলেই চুপ্ চাপ্ বসিয়া আছে।

তর্জ্জার গূঢ় অর্থ বোধ হয় এই যে :—প্রভু, কলিহত জীবকে কৃষ্ণপ্রেম দেওয়ার নিমিত্তই তোমাকে আহ্বান করিয়াছিলাম ; তুমিও কৃপা করিয়া আসিয়াছ, আসিয়া নির্ব্বিচারে, যাকে তাকে কৃষ্ণপ্রেম দিয়াছ ; এখন সকলেই প্রেম পাইয়াছে, সকলেই প্রেমোন্মত্ত ; কৃষ্ণপ্রেম পায় নাই—এমন লোক এখন আর একজনও নাই ; সুতরাং প্রেম-বিতরণেরও আর কোনও প্রয়োজন নাই।

বাউলকে কহিয়—ইহা কহিয়াছে বাউল—শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য আরও বলিলেন, "জগদানন্দ! তুমি সেই বাউলকে (প্রেমোন্মত্ত শ্রীমন্মহাপ্রভুকে) বলিও যে, বাউল (প্রেমোন্মত্ত অদ্বৈত আচার্য্য) ইহা (এই তর্জ্জা) বলিয়াছে।"

২১। **এত শুনি**—তর্জ্জা শুনিয়া।

হাসিতে লাগিলা—প্রহেলী শুনিয়া, তাহার গূঢ় অর্থ না বুঝিয়া এবং যথাশ্রুত অর্থ হাস্যজনক বলিয়া জগদানন্দ হাসিলেন।

প্রভুকে কহিলা—আচার্য্যের তর্জ্জা প্রভুকে বলিলেন।

২২। **ঈষৎ হাসিলা**—একটু হাসিলেন। "কাজের সময় ডাকা, আর কাজ সারিয়া গেলেই তাড়াইয়া দেওয়া"—তর্জ্জা শুনিয়া এইরূপ একটা কথা মনে পড়িতেই বোধহয় প্রভু একটু হাসিলেন। জগতের কল্যাণের নিমিত্ত অদ্বৈতাচার্য্যই প্রভুকে আহ্বান করিয়া আনিয়াছিলেন ; এখন, তর্জ্জায় প্রভুকে জানাইলেন—"জগতের কল্যাণ হইয়া গিয়াছে, কল্যাণজনক কোনও কাজই আর বাকী নাই।" ইহা দ্বারা ভঙ্গীতে জানাইলেন যে, "প্রভু, তোমার আর প্রকট থাকার কোনও দরকার নাই, অর্থাৎ ইচ্ছা করিলে তুমি এখন অন্তর্দ্ধান করিতে পার।"

তাঁর যেই আজ্ঞা—তর্জ্জা শুনিয়া, আচার্য্যের অভিপ্রায় বুঝিয়া প্রভু একটু হাসিয়াই বলিলেন—"আচ্ছা, তথাস্তু ; আচার্য্যের ইচ্ছাই পূর্ণ হউক," ইহা বলিয়াই প্রভু চুপ করিয়া রহিলেন।

জানিঞাহো স্বরূপগোসাঞি প্রভুরে পুছিল—
এই ত তর্জ্জার অর্থ বুঝিতে নারিল ॥ ২৩
প্রভু কহে—আচার্য্য হয় পূজক প্রবল।
আগম-শাস্ত্রের বিধি-বিধানে কুশল ॥ ২৪
উপাসনা-লাগি দেবের করে আবাহন।
পূজা লাগি কথোকাল করে নিরোধন ॥ ২৫
পূজা-নির্ব্বাহ হৈলে পাছে করে বিসর্জ্জন।
তর্জ্জার না জানি অর্থ—কিবা তাঁর মন? ॥ ২৬
মহাযোগেশ্বর আচার্য্য তর্জ্জাতে সমর্থ।
আমিহো বুঝিতে নারি তরজার অর্থ ॥ ২৭
শুনিয়া বিস্মিত হৈলা সব ভক্তগণ।
স্বরূপগোসাঞি কিছু হইলা বিমন ॥ ২৮

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

মৌন করিল—চুপ করিয়া রহিলেন। অদ্বৈত-আচার্য্য যে তাঁহাকে অন্তর্দ্ধান করার ইঙ্গিতই দিয়াছেন, ইহা সকলের নিকট প্রকাশ করিলে সকলেরই মনে কষ্ট হইবে, তাই প্রভু মৌনাবলম্বন করিলেন।

২৩। স্বরূপ-দামোদর তর্জ্জার অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়াছিলেন; তথাপি—বোধহয় নিজের মনের সন্দেহ দূর করিবার উদ্দেশ্যে, অথবা নিজে যাহা বুঝিয়া দুঃখিত হইয়াছিলেন, তদ্বিপরীত কিছু শুনিবার লোভেই প্রভুকে তর্জ্জার মর্ম্ম জিজ্ঞাসা করিলেন।

২৪। স্বরূপদামোদরের জিজ্ঞাসায় প্রভু তর্জ্জার অভিপ্রায় ব্যক্ত করিতে লাগিলেন; কিন্তু তাহাও স্পষ্ট করিয়া বলিলেন না; প্রভুও অন্য কথার ব্যপদেশে ইঙ্গিতে অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন।

আচার্য্য—অদ্বৈত আচার্য্য। **পূজক প্রবল**—শক্তিশালী পূজক। **আগম-শাস্ত্রের** ইত্যাদি—আগম-শাস্ত্রে পূজার যে সমস্ত বিধানাদি আছে, অদ্বৈত-আচার্য্য সে সমস্ত বিধানে বিশেষ অভিজ্ঞ। **কুশল**—অভিজ্ঞ।

২৫। আগমের বিধান এই যে, পূজার নিমিত্ত দেবতাকে আহ্বান করিতে হয়; যতক্ষণ পূজা হয়, ততক্ষণ দেবতাকে পূজাস্থানে আবদ্ধ করিয়া রাখিতে হয় এবং পূজা শেষ হইয়া গেলে দেবতাকে বিসর্জ্জন (বিদায়) দিতে হয়।

উপাসনা-লাগি—পূজার উদ্দেশ্যে। **আবাহন**—আহ্বান। **করে নিরোধন**—দেবতাকে আবদ্ধ করিয়া রাখে, অন্যত্র যাইতে দেয় না।

২৬। **পূজা নির্ব্বাহ** ইত্যাদি—পূজা শেষ হইয়া গেলে দেবতাকে বিসর্জ্জন দেয়।

ভঙ্গীতে প্রভু জানাইলেন যে, "জগতে কৃষ্ণপ্রেম প্রচারের নিমিত্ত আচার্য্য আমাকে আহ্বান করিয়া আনিয়াছেন; যতক্ষণ প্রেম-প্রচার কার্য্য চলিতেছিল, ততক্ষণ আমাকে রাখিয়াছেন; এখন, প্রেম-প্রচারের আর প্রয়োজন নাই, তাই আমাকে বিদায় দিতেছেন।"

তর্জ্জার না জানি অর্থ—সকলের নিকটে যেন তর্জ্জার গূঢ় অভিপ্রায়টী প্রকাশ না পায়, তাই প্রভু বলিলেন, "তর্জ্জার অর্থ আমি জানি না"।

কিবা তাঁর মন—অদ্বৈত আচার্য্যের অভিপ্রায় কি, তাহাও জানি না।

২৭। প্রভু যে তর্জ্জার অর্থ বুঝেন নাই, সকলের মনে এই বিশ্বাস জন্মাইবার জন্য প্রভু বলিলেন—"আচার্য্য মহাযোগেশ্বর; তিনি নিজেও তর্জ্জা প্রস্তুত করিতে জানেন, সকল তর্জ্জার অর্থও তিনি জানেন, (তর্জ্জাতে সমর্থ)। তর্জ্জার অর্থ বুঝিবার শক্তি আমার নাই।"

২৮। **বিস্মিত**—আচার্য্য এমন তর্জ্জা করিয়া পাঠাইয়াছেন, যাহার অর্থ প্রভুও বুঝিতে পারেন না; যিনি কত কত কঠিন সমস্যার সমাধান করিতে পারেন, সেই প্রভুও এই তর্জ্জার অর্থ বুঝিলেন না, ইহা ভাবিয়া সকলে বিস্মিত হইলেন।

বিমন—মনে দুঃখিত; বিষণ্ণ। স্বরূপ গোসাঞি তর্জ্জার অভিপ্রায় বুঝিয়াছিলেন; তাই প্রভুর লীলা-সম্বরণের সম্ভাবনা বুঝিয়া তিনি বিষণ্ণ হইলেন।

সেই দিন হৈতে প্রভুর আর দশা হৈল।
কৃষ্ণের বিচ্ছেদ-দশা দ্বিগুণ বাঢ়িল ॥ ২৯
উন্মাদ-প্রলাপ চেষ্টা করে রাত্রিদিনে।
রাধাভাবাবেশে বিরহ বাঢ়ে অনুক্ষণে ॥ ৩০
আচম্বিতে স্ফুরে কৃষ্ণের মথুরা-গমন।
উদ্‌ঘূর্ণাদশা হৈল উন্মাদলক্ষণ ॥ ৩১
রামানন্দের গলা ধরি করে প্রলপন।
স্বরূপে পুছয়ে মানি নিজসখীজন ॥ ৩২
পূর্ব্বে যেন বিশাখাকে রাধিকা পুছিলা।
সেই শ্লোক পঢ়ি প্রলাপ করিতে লাগিলা ॥ ৩৩

তথাহি ললিতমাধবে (৩।২৫)—
ক্ব নন্দকুলচন্দ্রমাঃ ক্ব শিখিচন্দ্রকালঙ্কৃতিঃ
ক্ব মন্দ্রমুরলীরবঃ ক্ব নু সুরেন্দ্রনীলদ্যুতিঃ।
ক্ব রাসরসতাণ্ডবী ক্ব সখি জীবরক্ষৌষধি-
র্নিধির্মম সুহৃত্তমঃ ক্ব বত হন্ত বা ধিগ্‌বিধিম্ ॥ ২

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

হে সখি হে বিশাখে! নন্দকুলচন্দ্রমা নন্দনন্দনঃ ক্ব কুত্র দর্শয় ইতি শেষঃ। শিখিচন্দ্রিকালঙ্কৃতিঃ ময়ূরপুচ্ছ-ভূষিতঃ ক্ব কুত্র। মন্দ্রমুরলীরবঃ গভীরবংশীধ্বনিঃ ক্ব কুত্র। নু ভো হে সখি! সুরেন্দ্রনীলদ্যুতিঃ ইন্দ্রনীলমণিকান্তিঃ

গৌর-কৃপা তরঙ্গিণী টীকা।

২৯। **সেই দিন হৈতে**—যে দিন আচার্য্যের তর্জ্জা পাইলেন, সেই দিন হইতে।

আর দশা—অন্যরূপ অবস্থা। এ পর্য্যন্ত অবতারের অনুষঙ্গিক উদ্দেশ্য জীব-উদ্ধার কার্য্যের অনুরোধে সময় সময় প্রভুর বাহ্যদশার উদয় হইত; কিন্তু যে দিন তর্জ্জা পাইলেন, সেই দিন প্রভু বুঝিলেন যে, জীব-উদ্ধার কার্য্য সমাধা হইয়াছে; তাই সেই দিন হইতে প্রভু অবতারের মুখ্য উদ্দেশ্য—ব্রজলীলার আস্বাদন কার্য্যেই সম্পূর্ণরূপে চিত্ত-নিবেশ করিলেন। ইহাই বাহ্যদৃষ্টিতে প্রভুর অবস্থান্তর।

কৃষ্ণের বিচ্ছেদ-দশা ইত্যাদি—সেই দিন হইতে, রাধাভাবে প্রভুর কৃষ্ণবিরহ-দশা পূর্ব্বাপেক্ষা দ্বিগুণ বাড়িয়া গেল।

৩০। **উন্মাদ প্রলাপ-চেষ্টা**—দিব্যোন্মাদের আচরণ এবং প্রলাপ। **রাধাভাবাবেশে**—কৃষ্ণবিরহব্যাকুলা শ্রীরাধার ভাবে আবিষ্ট হইয়া। **অনুক্ষণ**—সর্ব্বদা, প্রতিক্ষণে।

৩১। **আচম্বিতে** ইত্যাদি—শ্রীরাধাভাবের আবেশে হঠাৎ প্রভুর মনে হইল, শ্রীকৃষ্ণ অক্রূরের রথে চড়িয়া মথুরায় গমন করিতেছেন।

উদ্‌ঘূর্ণা ইত্যাদি—দিব্যোন্মাদের ফলে প্রভু উদ্‌ঘূর্ণাদশা প্রাপ্ত হইলেন (কৃষ্ণবিচ্ছেদে)। ৩।১৪।১৪ পয়ারের টীকায় উদ্‌ঘূর্ণার লক্ষণ দ্রষ্টব্য। প্রেম-বৈবশ্যের কায়িক-অভিব্যক্তিই উদ্‌ঘূর্ণা।

৩২। দিব্যোন্মাদের বশীভূত হইয়া প্রভু নিজেকে শ্রীরাধা এবং স্বরূপদামোদর ও রায় রামানন্দকে তাঁহার সখী মনে করিয়া তাঁহাদের গলা জড়াইয়া ধরিয়া নিজের মনের দুঃখ প্রকাশ করিতেন। এই সমস্ত উদ্‌ঘূর্ণার লক্ষণ।

স্বরূপে পুছয়ে—স্বরূপকে জিজ্ঞাসা করিলেন; "ক্ব নন্দকুলচন্দ্রমা" ইত্যাদি পশ্চাদুক্ত শ্লোকের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন।

৩৩। **পূর্ব্বে**—ব্রজলীলায়। **যেন**—যেইরূপে।

সেই শ্লোক—"ক্ব নন্দকুলচন্দ্রমা" ইত্যাদি যে শ্লোক ব্রজলীলায় শ্রীরাধা বিশাখাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, সেই শ্লোক।

প্রভু প্রথমতঃ ঐ শ্লোকটি পড়িলেন; তারপর প্রলাপচ্ছলে তাহার অর্থ করিতে লাগিলেন। ইহা শ্রীরূপ-গোস্বামীর ললিতমাধবের শ্লোক; শ্রীরূপ যখন নীলাচলে আসিয়া প্রভুকে তাঁহার রচিত ললিতমাধব ও বিদগ্ধমাধব নাটক শুনাইয়াছিলেন, তখনই বোধহয় প্রভু এই শ্লোকটী মনে করিয়া রাখিয়াছিলেন।

শ্লো। ২। অন্বয়। অন্বয় সহজ।

যথারাগঃ—

ব্রজেন্দ্রকুল-দুগ্ধ-সিন্ধু, কৃষ্ণ তাহে পূর্ণ ইন্দু
জন্মি কৈল জগৎ উজোর।
কান্ত্যমৃত যেবা পিয়ে, নিরন্তর পিয়া জীয়ে,
ব্রজজনের নয়ন-চকোর ॥ ৩৪

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

ক কুত্র। রাসরসতাণ্ডবী রাসরসনর্ত্তনশীলঃ ক কুত্র। জীবরক্ষৌষধিঃ প্রাণরক্ষণায় মুখ্যৌষধিঃ ক কুত্র। নিধিঃ অমূল্যরত্নং মম সুহৃত্তমঃ স ক কুত্র। বত হন্ত হা বিধিং ধিক্। চক্রবর্ত্তী। ২

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

অনুবাদ। শ্রীরাধা কহিতেছেন—হে সখি! নন্দকুল-চন্দ্রমা কোথায়? শিখি-পুচ্ছ-ভূষণ (শ্রীকৃষ্ণ) কোথায়? যিনি গম্ভীর মুরলী-ধ্বনি করেন, তিনি কোথায়? ইন্দ্রনীল-মণির ন্যায় কান্তি যাঁহার, তিনি কোথায়? রাস-রস-তাণ্ডবী কোথায়? হে সখি! আমার প্রাণরক্ষার ঔষধি কোথায়? হায়! হায়! আমার সুহৃত্তম— আমার অমূল্যরত্ন কোথায়? (এতাদৃশ প্রিয়তমের সহিত যে আমার বিয়োগ উৎপাদন করিল) হায়! সেই বিধিকে ধিক্। ২

(অক্রুরের সহিত শ্রীকৃষ্ণ মথুরায় চলিয়া গেলে পর বিরহ-জ্বালা-বিহ্বলা শ্রীরাধা এই শ্লোকোক্ত কথাগুলি বিশাখার প্রতি বলিয়াছিলেন)

নন্দকুলচন্দ্রমাঃ—নন্দের (শ্রীনন্দমহারাজের) কুলের (বংশের) চন্দ্রমা (চন্দ্রসদৃশ); চন্দ্র উদিত হইলে যেমন আকাশের অন্ধকার দূরীভূত হয়, সমগ্র আকাশ নির্ম্মল আলোকে উদ্ভাসিত হইয়া উঠে, শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাবেও নন্দবংশের সমস্ত শোক-দুঃখ তিরোহিত হইয়াছে, সুখের হিল্লোলে তাহা ভাসমান হইয়া আছে। নন্দবংশের মুখোজ্জ্বলকারী। **শিখিচন্দ্রিকালঙ্কৃতিঃ**—শিখীর (ময়ূরের) চন্দ্রিকাই (পুচ্ছই—চন্দ্রের ন্যায় চিহ্নবিশিষ্ট ময়ুরপুচ্ছই) অলঙ্কৃতি (অলঙ্কার) যাঁহার; ময়ূরপুচ্ছভূষিত। **মন্দ্রমুরলীরবঃ**—মন্দ্র (গম্ভীর) মুরলীর রব যাঁহার; যাঁহার মধুর-মুরলীধ্বনি অত্যন্ত গম্ভীর। **সুরেন্দ্র-নীলদ্যুতিঃ**—সুরেন্দ্রনীলের (ইন্দ্রনীলমণির) দ্যুতির ন্যায় দ্যুতি (কান্তি) যাঁহার; যাঁহার অঙ্গকান্তি ইন্দ্রনীলমণির কান্তির ন্যায় স্নিগ্ধ ও সুন্দর। **রাসরসতাণ্ডবী**—রাসরসে নর্ত্তনশীল; রাস-রসের উল্লাসে যিনি নৃত্য করিয়া থাকেন। **জীবরক্ষৌষধিঃ**—জীবের (জীবনের, প্রাণের) রক্ষাবিষয়ে ঔষধি যিনি; যিনি প্রাণরক্ষাবিষয়ে মহৌষধিতুল্য; প্রাণের সঙ্কটাপন্ন অবস্থায় একমাত্র যাঁহার দর্শনে প্রাণরক্ষা হইতে পারে। **নিধিঃ**—অমূল্যরত্ন; যিনি আমার পক্ষে অমূল্যরত্ন, আমার একমাত্র গৌরবের সম্পত্তিতুল্য, যাঁহার অভাবে আমার জীবনের কোনও মূল্য—কোনই সার্থকতা থাকে না। **সুহৃত্তমঃ**—প্রিয়তম, বন্ধুদিগের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা অন্তরঙ্গ। **ধিক্ বিধিম্**—যে বিধাতা আমার এইরূপ দুর্দ্দশার বিধান করিয়াছেন, যাঁহার বিধানে আমার এতাদৃশ সুহৃত্তমও আমার নিকট হইতে দূরে সরিয়া পড়িয়াছেন, সেই বিধাতাকে ধিক্।

এই শ্লোকের তাৎপর্য্য পরবর্ত্তী ত্রিপদীসমূহে বিবৃত হইয়াছে।

৩৪। কৃষ্ণবিরহখিন্না শ্রীরাধার ভাবে আবিষ্ট হইয়া প্রলাপ করিতে করিতে প্রভু শ্লোকের অর্থ করিতেছেন। প্রথমে "ক নন্দকুলচন্দ্রমা" অংশের অর্থ করিতেছেন (নন্দকুলচন্দ্রমা কোথায়?)। চন্দ্রমা-শব্দের অর্থ চন্দ্র; চন্দ্রের আবির্ভাব ক্ষীর-সমুদ্রে, চন্দ্র সমস্ত জগৎকে আলো দান করে। নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণরূপ চন্দ্রও কোনও এক ক্ষীর-সমুদ্র বিশেসে আবির্ভূত হইয়াছেন এবং তিনিও সমস্ত জগৎকে আলোকিত করিয়াছেন (শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের দর্শনে জগতের দুঃখ-দৈন্যাদি অন্তর্হিত হওয়ায় সকলের চিত্ত আনন্দধারায় অভিষিক্ত হইয়া প্রফুল্লতা ধারণ করিয়াছে)—তাহাই প্রথম ত্রিপদীতে দেখাইতেছেন।

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

ব্রজেন্দ্র—ব্রজরাজ শ্রীনন্দ মহারাজা। **দুগ্ধ-সিন্ধু**—দুগ্ধের সমুদ্র। **ব্রজেন্দ্র-কুল-দুগ্ধ-সিন্ধু**—শ্রীনন্দ-মহারাজের বংশরূপ দুগ্ধের সমুদ্র। শ্রীনন্দের কুলে শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব; চন্দ্রের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের তুলনা দেওয়ায় নন্দকুলকে দুগ্ধসিন্ধুর সঙ্গে তুলিত করা হইয়াছে; যেহেতু, দুগ্ধসিন্ধুতেই চন্দ্রের আবির্ভাব হয়। **তাঁহে**—সেই ব্রজেন্দ্রকুল-দুগ্ধ-সিন্ধুতে। **পূর্ণ ইন্দু**—পূর্ণচন্দ্র; যাঁহার কখনও হ্রাস নাই, বৃদ্ধি নাই, যিনি সর্ব্বদাই পূর্ণ থাকেন, এইরূপ চন্দ্র। কৃষ্ণই এইরূপ চন্দ্র। **জন্মি**—জন্মিয়া, আবির্ভূত হইয়া (ব্রজেন্দ্রকুল-দুগ্ধ-সিন্ধুতে)।

উজোর—উজ্জ্বল, আলোকিত। শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রকে দর্শন করায় সকলেরই বিষাদ-দৈন্যাদি দূরীভূত হইয়াছে, সকলের চিত্ত এবং বদনই আনন্দের স্নিগ্ধ আলোকে উদ্ভাসিত হইয়াছে।

যাঁহার কখনও হ্রাস নাই, বৃদ্ধি নাই, যিনি সর্ব্বদাই পরিপূর্ণ থাকেন—শ্রীকৃষ্ণরূপ সেই পূর্ণচন্দ্র শ্রীনন্দকুলরূপ দুগ্ধ-সমুদ্রে আবির্ভূত হইয়া স্বীয় লাবণ্য ও প্রীতির জ্যোৎস্নায় সমস্ত জগৎকে আলোকিত করিয়া সমুজ্জ্বল করিয়াছেন।

চন্দ্রের আর একটী গুণ এই যে, চন্দ্র অমৃত দান করে, সেই অমৃত পান করিয়া চকোর জীবন ধারণ করে; শ্রীকৃষ্ণরূপ চন্দ্রেরও যে এই গুণটী আছে, তাহাই এই ত্রিপদীতে দেখাইতেছেন।

কান্ত্যমৃত—শ্রীকৃষ্ণের কান্তি (কমনীয় অঙ্গজ্যোতি, লাবণ্য)-রূপ অমৃত। শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গ-কান্তিই তাঁহার (নন্দকুলচন্দ্রমার) অমৃত। **পিয়া**—পান করিয়া। **জীয়ে**—জীবন ধারণ করে। **ব্রজজনের নয়নচকোর**—ব্রজবাসীদিগের নয়ন-রূপ চকোর। **চকোর**—এক রকম পক্ষী, চন্দ্রের সুধা পান করিয়া জীবন ধারণ করে।

চন্দ্রের সুধা পান করিয়া যেমন চকোর-পক্ষী জীবন ধারণ করে, এই শ্রীকৃষ্ণরূপ পূর্ণচন্দ্রের অঙ্গ-কান্তিরূপ সুধা সর্ব্বদা পান করিয়াও ব্রজবাসীদিগের নয়নরূপ চকোর জীবন ধারণ করিয়া থাকে।

চকোরের সঙ্গে নয়নের তুলনা দেওয়ার তাৎপর্য্য এই যে, চকোর যেমন চন্দ্রের সুধা ব্যতীত অপর কিছুই পান করিয়া বাঁচিতে পারে না, তাই অপর কিছু পান করিতেও চাহে না—তদ্রূপ, ব্রজবাসীদিগের নয়নও শ্রীকৃষ্ণের রূপ ব্যতীত অন্য কিছু দেখিয়াই তৃপ্তিলাভ করিতে পারে না, তাই অন্য কিছু দেখিতেও ইচ্ছা করে না। আবার চন্দ্রের সুধা যেমন চকোরের জীবনীশক্তি বৃদ্ধি করে, চকোরকে উত্তরোত্তর আরও বেশী সুধা পান করিবার শক্তি দেয়, তদ্রূপ, শ্রীকৃষ্ণের রূপ-দর্শন করিলেও, তাহা উত্তরোত্তর আরও বেশী করিয়া দেখিবার নিমিত্ত ব্রজবাসীদের নয়নের বলবতী পিপাসা জন্মে।

"জীয়ে" শব্দের সার্থকতা এইরূপ। কেবল প্রাণধারণ করিলেই প্রকৃতরূপে বাঁচিয়া থাকা বলা যায় না; প্রাণধারণের সার্থকতাতেই প্রকৃত জীবন (বাঁচা)। যে লোক সর্ব্বদাই নিদ্রা ও আলস্যে কাল কাটায়, তাহার জীবনের কোনও সার্থকতাই নাই, তাহার জীবনে ও মৃত্যুতে কোনও পার্থক্য নাই—তাহার জীবনও মৃত্যুতুল্যই। এইরূপে নয়নের সার্থকতাতেই নয়নের জীবন। কিন্তু নয়নের সার্থকতা কিসে হয়? দেখিবার নিমিত্তই নয়ন; চিত্তের তৃপ্তিদায়ক সুন্দর বস্তুর দর্শনেই নয়নের সার্থকতা। শ্রীকৃষ্ণরূপেই সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্যের পরাকাষ্ঠা। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণরূপ-দর্শনেই নয়নের সার্থকতারও পরাকাষ্ঠা; যে নয়ন শ্রীকৃষ্ণরূপ দেখিতে পায়, সেই নয়নকেই জীবিত বলা যায়। শ্রীকৃষ্ণরূপ ব্যতীত অন্য কোনও রূপ দেখিলে ব্রজবাসীরা তৃপ্তি পান না, তাঁহাদের নয়নের সার্থকতা হইতেছে বলিয়াও মনে করেন না; তাই বলা হইয়াছে, শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গ-কান্তি দেখিয়াই তাঁহাদের নয়ন জীবিত থাকে।

"পিয়ে" শব্দেরও বোধহয় একটা ধ্বনি আছে। ব্রজবাসীদিগের নয়ন শ্রীকৃষ্ণের কান্তি-সুধা নিরন্তর পান করে। তরল বস্তুই পান করা যায়; কঠিন বস্তু পান করা যায় না, ভোজন করা যায়। পানীয় তরল বস্তু নিরবচ্ছিন্নভাবে পান করা যায়; কিন্তু কঠিন ভোজ্য বস্তু নিরবচ্ছিন্নভাবে ভোজন করা চলে না; প্রতি দুই গ্রাসের মধ্যে ব্যবধান থাকে। ত্রিপদীর "পিয়ে" শব্দে বোধহয় পানের নিরবচ্ছিন্নতা ধ্বনিত হইতেছে। ব্রজবাসীদিগের নয়ন নিরবচ্ছিন্নভাবে শ্রীকৃষ্ণের রূপসুধা পান করিবার নিমিত্ত লালায়িত; তাই ব্রজবাসিগণ নয়নের পলক-নির্ম্মাতা বিধাতাকে পর্য্যন্ত

সখি হে! কোথা কৃষ্ণ করাহ দর্শন॥
ক্ষণেক যাঁহার মুখ, না দেখিলে ফাটে বুক,
শীঘ্র দেখাও, না রহে জীবন॥ ধ্রু॥ ৩৫

এই ব্রজের রমণী, কামার্ক-তপ্ত-কুমুদিনী,
নিজকরামৃত দিয়া দান।
প্রফুল্লিত করে যেই, কাহাঁ মোর চন্দ্র সেই,
দেখাও সখি! রাখ মোর প্রাণ॥ ৩৬

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

তিরস্কার করিয়াছেন—কেন তিনি চক্ষুর পলক দিলেন? পলক না দিলে তাঁহারা নিরবচ্ছিন্নভাবে শ্রীকৃষ্ণরূপ দর্শন করিতে পারিতেন।

৩৫। অসমোর্দ্ধমাধুর্য্যময় শ্রীকৃষ্ণরূপের উল্লেখ করাতে সেই রূপ দর্শনের নিমিত্ত রাধাভাবাবিষ্ট প্রভুর বলবতী উৎকণ্ঠা জন্মিল; তাই পার্শ্ববর্ত্তী স্বরূপ-দামোদরকে নিজের (রাধার) সখী মনে করিয়া তাঁহার গলা ধরিয়া অত্যন্ত ব্যাকুলতার সহিত তিনি বলিলেন—"সখি হে!" ইত্যাদি।

৩৬। কুমুদিনী (সাপুলা) দিবাভাগে মুদ্রিত হইয়া থাকে, রাত্রিতে প্রস্ফুটিত হয়; ইহা লক্ষ্য করিয়া বলা হয় যে, কুমুদিনীসমূহ দিবাভাগে যেন সূর্য্যের উত্তাপেই ম্রিয়মাণ হইয়া থাকে; চন্দ্র রাত্রিকালে নিজের কিরণরূপ অমৃতদ্বারা তাহাদিগকে পুনর্জীবিত করে, প্রস্ফুটিত করে। ইহা চন্দ্রের একটী বিশেষ গুণ। শ্রীকৃষ্ণরূপ চন্দ্রেরও যে এই গুণ আছে, তাহাই এই ত্রিপদীতে দেখাইতেছেন। এই ত্রিপদীতে কুমুদিনীর সঙ্গে ব্রজসুন্দরীগণের, সূর্য্যতাপের সঙ্গে তাঁহাদের কন্দর্পপীড়ার এবং চন্দ্রকিরণের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের হস্ত-স্পর্শের তুলনা করা হইয়াছে। যেমন কুমুদিনীগণ সূর্য্য-তাপে ম্রিয়মাণ হইয়া থাকে, চন্দ্র নিজের কিরণদ্বারা তাহাদিগকে সঞ্জীবিত করে; তদ্রূপ ব্রজরমণীগণ কন্দর্পপীড়ায় ম্রিয়মাণ হইয়া থাকেন, শ্রীকৃষ্ণ নিজের হস্তস্পর্শদ্বারা তাঁহাদের কন্দর্পপীড়া দূর করিয়া তাঁহাদিগকে সঞ্জীবিত করেন।

কাম—কন্দর্প। ১।৪।২৫-শ্লোক এবং ২।৮।৮৭ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। **অর্ক**—সূর্য্য। **তপ্ত**—তাপিত।

কামার্ক—কন্দর্পরূপ সূর্য্য। সূর্য্যের উত্তাপে যেমন কুমুদিনীগণ বিশীর্ণ হইয়া যায়, তদ্রূপ ব্রজদেবীগণও কন্দর্প-পীড়ায় বিশীর্ণ হইয়া যান। তাই কন্দর্পকে সূর্য্যসদৃশ বলা হইয়াছে।

কামার্ক-তপ্ত-কুমুদিনী—কন্দর্পরূপ সূর্য্যের তাপে তাপিত ব্রজরমণীরূপ কুমুদিনী।

ব্রজের রমণী ইত্যাদি—ব্রজরমণীগণ কন্দর্পরূপ সূর্য্যের তাপে তাপিত কুমুদিনীতুল্য। কুমুদিনীগণ যেমন সূর্য্যের তাপে তাপিত হইয়া ম্রিয়মাণ হয়, ব্রজরমণীগণও তদ্রূপ কন্দর্প-পীড়ায় (কন্দর্প-জ্বালায়) জর্জ্জরিত হয়েন।

নিজ করামৃত—নিজের কররূপ অমৃত; চন্দ্রপক্ষে কর-শব্দের অর্থ কিরণ; কৃষ্ণ-পক্ষে কর-শব্দের অর্থ হস্ত বা হস্তস্পর্শ। চন্দ্র যেমন নিজের কিরণরূপ অমৃত দ্বারা ম্রিয়মাণা কুমুদিনীকে প্রফুল্ল করে, শ্রীকৃষ্ণও তেমনি নিজের হস্তস্পর্শদ্বারা কন্দর্পজ্বালায় জর্জ্জরিতা ব্রজরমণীকে প্রফুল্ল করেন।

প্রফুল্লিত—কুমুদিনী-পক্ষে প্রস্ফুটিত; আর ব্রজরমণী-পক্ষে আনন্দোৎফুল্ল। **কাহাঁ**—কোথায়। **চন্দ্র সেই**—সেই কৃষ্ণরূপ চন্দ্র। এপর্য্যন্ত "ক্ব নন্দকুলচন্দ্রমাঃ" অংশের অর্থ গেল।

"ব্রজেন্দ্রকুল-দুগ্ধ-সিন্ধু" হইতে "রাখ মোর প্রাণ" পর্য্যন্ত:—শ্রীকৃষ্ণবিরহ-খিন্না শ্রীরাধার ভাবে আবিষ্ট শ্রীমন্-মহাপ্রভু স্বরূপদামোদরকে নিজের সখী মনে করিয়া মর্ম্মস্পর্শী দুঃখের সহিত বলিলেন,—"সখি! নন্দকুলচন্দ্র আমার সেই কৃষ্ণ কোথায়? সখি! আমার প্রাণবল্লভ ব্রজেন্দ্র-নন্দন তো সত্য সত্যই চন্দ্রতুল্য, চন্দ্রের সমস্ত গুণই তো তাঁহাতে আছে; না-না-সখি! চন্দ্র অপেক্ষা অনেক বেশী গুণ তাঁতে আছে। এই আকাশের চন্দ্রের তো হ্রাস আছে, বৃদ্ধি আছে, কলঙ্ক আছে; কিন্তু সখি! আমার কৃষ্ণ-শশী যে অকলঙ্ক, তাঁর হ্রাসবৃদ্ধি নাই সখি! তিনি নিত্যই পরিপূর্ণ—আর এই আকাশের চন্দ্র জগৎকে আলোকিত করিয়া উজ্জ্বল করে বটে; কিন্তু গুহার মধ্যে তার কিরণ তো প্রবেশ করিতে পারেনা, সখি! কিন্তু আমার কৃষ্ণচন্দ্রের মন্দহাসিরূপ জ্যোৎস্না জগদ্বাসী জীবের চিত্তগুহার বিষাদরূপ অন্ধকার পর্য্যন্ত দূরীভূত করিয়া সকলের চিত্ত ও মুখমণ্ডলকে অপূর্ব্ব আনন্দ-ধারায় পরিষিক্ত করিয়া দেয়। সখি! চকোর যেমন

কাহাঁ সে চূড়ার ঠান, 　　শিখিপিঞ্ছের উড়ান,
নবমেঘে যেন ইন্দ্রধনু।
পীতাম্বর তড়িদ্দ্যুতি, 　　মুক্তামালা বকপাঁতি,
নবাম্বুদ জিনি শ্যাম তনু॥ ৩৭

একবার যার নয়নে লাগে, 　　সদা তার হৃদয়ে জাগে,
কৃষ্ণতনু যেন আম্র-আঠা।
নারীর মন পৈশে হায়, 　　যত্নে নাহি বহিরায়,
তনু নহে,—সেয়াকুলের কাঁটা॥ ৩৮

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

চন্দ্রের সুধা পান করিয়া জীবন ধারণ করে, ব্রজবাসীদিগের নয়ন-চকোরও তেমনি কৃষ্ণচন্দ্রের অঙ্গকান্তিরূপ অমৃত পান করিয়াই কৃতার্থতা লাভ করে। তাহা দেখিতে না পাইয়া আমার নয়ন কিরূপে বাঁচিতে পারে সখি! সখি, সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্যের আধার আমার প্রাণবল্লভের রূপ ; তাঁহার বদনমণ্ডল লাবণ্যামৃতের জন্মস্থান ; কবে সখি, আমি নির্ণিমেষ-নয়নে, নিরবচ্ছিন্নভাবে তাহা দর্শন করিয়া জন্ম সার্থক করিতে পারিব ? তাঁহাকে দর্শন করিবার নিমিত্ত উৎকণ্ঠায় আমার প্রাণ ছট্‌ফট্ করিতেছে। কোথায় সখি, আমার প্রাণকৃষ্ণ ? সখি, একবার আমায় তাঁকে দেখা। নিমেষ-পরিমিত কালও যাঁহাকে দেখিতে না পাইলে প্রাণ ফাটিয়া যায়, এতদিন পর্য্যন্ত তাঁহাকে না দেখিয়া কিরূপে জীবন ধারণ করিতে পারি, সখি! তাঁহার অদর্শনে আমার জীবন গেল সখি! তোকে মিনতি করিয়া বলিতেছি, শীঘ্র তাঁকে একবার দেখা, নতুবা আমি বাঁচিব না সখি! কন্দর্পের অকরুণ অত্যাচারও যে আর সহ্য হয় না সখি! তীক্ষ্ণ-শরজালে বিদ্ধ করিয়া আমার হৃদয় জর্জ্জরিত করিতেছে। আবার মধ্যাহ্ন-মার্ত্তণ্ডের জ্বালা অপেক্ষাও অধিকতর জ্বালা দিয়া আমাকে দগ্ধীভূত করিতেছে! কি করিব সখি! এই বিপদ হইতে আমাকে কে উদ্ধার করিবে—সেই নন্দকুল-চন্দ্র ব্যতীত ? প্রখর-সূর্য্যকর-তপ্ত কুমুদিনীর প্রফুল্লতাবিধান চন্দ্রব্যতীত আর কে করিতে পারে সখি! আর কার করামৃতস্পর্শে কুমুদিনী পুনর্জ্জীবিত হইতে পারে ? তাই মিনতি করিয়া বলি সখি, একবার সেই নন্দকুল-চন্দ্রমাকে দেখা, দেখাইয়া আমার প্রাণরক্ষা কর সখি!"

৩৭। এক্ষণে "ক্ব শিখিচন্দ্রিকালঙ্কৃতিঃ" অংশের অর্থ করিতেছেন।

কাহাঁ—কোথায়। **ঠান**—স্থান, স্থিতি। **চূড়ার ঠান**—চূড়ার স্থান ; যাঁহার মস্তকে চূড়ার স্থান, সেই শ্রীকৃষ্ণ। **কাহাঁ সে চূড়ার ঠান**—যাঁহার মস্তকে চূড়া শোভা পায়, সেই শ্রীকৃষ্ণ কোথায় ? **শিখিপিঞ্ছ**—ময়ূরের পুচ্ছ। **উড়ান**—উড্ডীনতা। **শিখি পিঞ্ছের উড়ান**—চূড়াস্থিত ময়ূর-পুচ্ছের উড্ডীনতা। "শিখিপিঞ্ছের উড়ান" কিরূপ তাহা বলিতেছেন—**"নবমেঘে যেন ইন্দ্রধনু"**—শ্রীকৃষ্ণের শ্যামতনুর উপরিভাগে চূড়াস্থিত ময়ূর-পুচ্ছ যখন উড়িতে থাকে, তখন মনে হয় যেন নূতন মেঘের মধ্যে ইন্দ্রধনু শোভা পাইতেছে। শ্রীকৃষ্ণের বর্ণের সঙ্গে নবমেঘের বর্ণের সাদৃশ্য আছে ; আর ইন্দ্রধনুর বিবিধ বর্ণের সঙ্গেও ময়ূর-পুচ্ছের বিবিধ বর্ণের সাদৃশ্য আছে ; এজন্য এই উপমা।

শ্রীকৃষ্ণকে মেঘের সঙ্গে তুলনা দিয়া ইন্দ্রধনুর সঙ্গে চূড়াস্থিত ময়ূর-পুচ্ছের তুলনা দেওয়া হইয়াছে। মেঘের অন্যান্য লক্ষণও যে শ্রীকৃষ্ণে আছে, তাহাও দেখাইতেছেন।

মেঘে তড়িৎ থাকে ; শ্রীকৃষ্ণরূপ-মেঘেও তড়িৎ আছে ; শ্রীকৃষ্ণের পীতবসনই তড়িৎতুল্য (বর্ণসাম্যে)। মেঘের নীচে দিয়া অনেক সময় শুভ্রবক-পংক্তিকে মালার আকারে উড়িয়া যাইতে দেখা যায়, তখন মনে হয় যেন মেঘের দেহেই শুভ্র মালা দুলিতেছে। শ্রীকৃষ্ণের বক্ষঃস্থিত মুক্তামালাও শ্রীকৃষ্ণ-বক্ষে তদ্রূপ শোভা পায়।

পীতাম্বর—পীতবর্ণ বস্ত্র, শ্রীকৃষ্ণের পরিধানের। **তড়িৎদ্যুতি**—তড়িতের (বিদ্যুতের) দ্যুতি (জ্যোতি)। শ্রীকৃষ্ণের পরিধানবস্ত্রের বর্ণ বিদ্যুতের বর্ণের ন্যায় পীত। তাই বর্ণসাম্যে শ্রীকৃষ্ণের পীতবসনকে তড়িদ্দ্যুতি বলা হইয়াছে। **মুক্তামালা**—শ্রীকৃষ্ণের বক্ষে বিলম্বিত শ্বেতবর্ণ মুক্তার মালা। **বকপাঁতি**—বকের পংক্তি (শ্রেণী) ; মেঘের কোলে মালার আকারে সজ্জিত শ্বেত বকশ্রেণী। **নবাম্বুদ**—নূতন মেঘ। **শ্যামতনু**—শ্রীকৃষ্ণের শ্যামবর্ণ দেহ। শ্রীকৃষ্ণের শ্যামবর্ণ দেহ বর্ণের মাধুর্য্যে নূতন মেঘকেও পরাজিত করে।

৩৮। **নয়নে লাগে**—দৃষ্টিগোচর হয় (শ্রীকৃষ্ণের শ্যামতনু)। "নয়নে"-স্থলে "হৃদয়ে"-পাঠান্তর দৃষ্ট হয়।

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

কৃষ্ণতনু—কৃষ্ণের দেহ ; কৃষ্ণরূপ। **আম্র-আঠা**—আমগাছের আঠা। আমগাছের আঠা যেখানে একবার লাগে, কিছুতেই সেখান হইতে তাহাকে সহজে উঠান যায় না ; কৃষ্ণের রূপও একবার যদি নয়নের ভিতর দিয়া হৃদয়ে প্রবেশ করিতে পারে, তাহা হইলে তাহাকে হৃদয় হইতে দূর করা যায় না। এজন্য ক্রিয়াসাম্যে, কৃষ্ণতনুকে (কৃষ্ণরূপকে) আম্র-আঠার তুল্য বলা হইয়াছে।

পৈশে—প্রবেশ করে (কৃষ্ণতনু)। **যত্নে নাহি বাহিরায়**—(কৃষ্ণতনুকে নারীর মন হইতে) বাহির করিবার জন্য অনেক যত্ন করিলেও বাহির (দূর) করা যায় না।

শ্রীকৃষ্ণরূপ (কৃষ্ণতনু) যদি নারীর মনে একবার প্রবেশ করিতে পারে, তবে সেইখানেই তাহা থাকিয়া যাইবে ; অনেক যত্ন করিলেও শ্রীকৃষ্ণরূপকে নারীর মন হইতে দূর করা সম্ভব হয়না। এজন্যই কৃষ্ণতনুকে সেয়াকুলের কাঁটার তুল্য বলা হইয়াছে।

সেয়াকুল—একরকম কাঁটা গাছ। ইহার কাঁটা সহজেই লোকের শরীরে প্রবেশ করে ; কিন্তু বাহির করিতে অত্যন্ত কষ্ট হয়, সহজে বাহির হইতে চায় না। ইহার গায়ে বোধহয় সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম কাঁটা আছে, যাহার মুখ বিপরীত দিকে, গাছের গোড়ার দিকে।

কাঁটার সঙ্গে কৃষ্ণরূপের তুলনা দেওয়ার আরও তাৎপর্য্য বোধহয় এই যে, কাঁটা যেমন শরীরের মধ্যে থাকিয়া যন্ত্রণা দেয়, শ্রীকৃষ্ণরূপও মনের মধ্যে থাকিয়া, শ্রীকৃষ্ণ-প্রাপ্তির নিমিত্ত উৎকণ্ঠা বাড়াইয়া কণ্টকবৎ যন্ত্রণা দেয়।

এপর্য্যন্ত "ক শিখিচন্দ্রিকালঙ্কৃতিঃ" অংশের অর্থ গেল।

"কাহাঁ সে চূড়ার ঠান" হইতে "সেয়াকুলের কাঁটা" পর্য্যন্ত :—রাধাভাবাবিষ্ট প্রভু বলিলেন—"সখি ! শিখিপিঞ্ছ-মৌলী আমার সেই প্রাণবল্লভ কোথায় ? শ্যামসুন্দরের মস্তকস্থিত চূড়ার উপরে যখন নীল-পীত-লোহিতাদি নানাবর্ণ-খচিত শিখিপুচ্ছ উড়িতে থাকে, তখন বন্ধুর সেই শ্যামজ্যোতিঃপুঞ্জের মধ্যে শিখিপুচ্ছের কতই না অপূর্ব্ব শোভা হইয়া থাকে ! ঠিক যেন নবমেঘে নানাবর্ণ-খচিত ইন্দ্রধনু শোভা পাইতেছে ! সখি, আমার শ্যামসুন্দরকে দেখিলে বাস্তবিকই নবীন মেঘ বলিয়াই মনে হয় ; মেঘ বলিয়া মনে হয় বটে, কিন্তু মেঘের সঙ্গে শ্যামসুন্দরের তুলনা হইতে পারে না। তাঁহার অঙ্গের শ্যামবর্ণ, স্নিগ্ধতায় এবং উজ্জ্বলতায় নবীন মেঘকেও যে পরাজিত করিয়া দেয় সখি ! আকাশে নূতন মেঘের উদয় হইলে, মালার আকারে সারি বাঁধিয়া সাদা সাদা বকগুলি যখন উড়িয়া যায়, মেঘাচ্ছন্ন আকাশের তখন যে শোভা হয়, শুভ্র মুক্তাহার-শোভিত—শ্যামসুন্দরের ইন্দ্রনীলমণি-কবাটতুল্য সুবিশাল বক্ষের শোভার নিকটে তাহা অতি তুচ্ছ সখি ! বন্ধুর আমার পীতবসনের বর্ণ বিদ্যুতের বর্ণের ন্যায় বটে ; বিদ্যুৎ অপেক্ষাও বন্ধুর পীতবসনের অপূর্ব্বতা আছে সখি ! বিদ্যুৎ তো চঞ্চল, শ্যামসুন্দরের পীতবসন অচঞ্চল, স্থির ; বিদ্যুৎ মেঘকে জড়াইয়া থাকিতে পারে না, মেঘের কোলে একটু হাসিয়া আবার মেঘের কোলেই লুক্কায়িত হয় ; কিন্তু শ্যামসুন্দরের পীতবসন শ্যামসুন্দরকে জড়াইয়া ধরিয়া নিজেও অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছে, আর শ্যামসুন্দরের শ্যাম-অঙ্গকেও অপূর্ব্ব শোভা-সম্পন্ন করিয়া তুলিয়াছে ; সৌদামিনীঘেরা নবীন-মেঘ যদি দেখিতে সাধ হয়, তবে একবার পীতাম্বর-ধর শ্যামসুন্দরের প্রতি দৃষ্টিপাত কর সখি ; দেখিবে কি অপূর্ব্ব রূপ ! একবার দেখিলে আর ভুলিতে পারিবে না—ভুলিতে চেষ্টা করিলেও ভুলিতে পারিবে না ! এই অপরূপ শ্যামরূপ, একবার যিনি দেখিয়াছেন, অমনি তাঁর নয়নের ভিতর দিয়া মরমে গিয়া লাগিয়াছে, মরম হইতে আর এই রূপকে কিছুতেই দূর করিতে পারিবে না সখি ! এ যেন আমের আঠার মতনই হৃদয়ে লাগিয়া থাকে সখি ! সেয়াকুলের কাঁটা যেমন সহজেই লোকের দেহে প্রবেশ করে, কিন্তু একবার প্রবেশ করিলে যেমন কিছুতেই সহজে তাহাকে বাহির করা যায় না—কৃষ্ণরূপও তদ্রূপ সখি ! কৃষ্ণরূপ দৃষ্টিমাত্রেই নারীর চিত্তে আসন পাতিয়া বসে, কিছুতেই আর তাহাকে হৃদয় হইতে বাহির করা যায় না সখি !"

জিনিয়া তমালদ্যুতি, ইন্দ্রনীলসম কান্তি,
যেই কান্তি জগত মাতায়।
শৃঙ্গার-রস তাতে ছানি, তাতে চন্দ্রজ্যোৎস্না-সানি
জানি বিধি নিরমিল তায়॥ ৩৯

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

৩৯। এক্ষণে "ক সু সুরেন্দ্রনীলদ্যুতিঃ" অংশের অর্থ করিতেছেন।

এই ত্রিপদীতে, পূর্ব্ব ত্রিপদী-উক্ত "কৃষ্ণতনুর" আরও অপূর্ব্ব আকর্ষণের কথা বলিতেছেন।

"জিনিয়া তমালদ্যুতি" ইত্যাদি ত্রিপদীর অন্বয়—ইন্দ্রনীলমণিসম যে (অনির্ব্বচনীয়) কান্তি তমালদ্যুতিকেও পরাজিত করে এবং যে অনির্ব্বচনীয় কান্তি জগৎকে মত্ত করে, তাহাতে (তাতে) শৃঙ্গার-রস ছানিয়া, তাতে (তাহার সঙ্গে, কান্তিতে ছাঁকা শৃঙ্গার-রসের সঙ্গে) চন্দ্র-জ্যোৎস্না সানিয়াই (মিশাইয়াই) বোধ হয় (জানি) বিধি তাহাকে (তায়, কৃষ্ণতনুকে) নির্ম্মাণ করিল।

জিনিয়া তমালদ্যুতি—তরুণ তমালের কান্তিকেও পরাজিত করে যে অনির্ব্বচনীয় কান্তি। **ইন্দ্রনীলসম কান্তি**—ইন্দ্রনীলমণির কান্তির ন্যায় কোন এক অনির্ব্বচনীয় কান্তি। **যেই কান্তি**—যে অনির্ব্বচনীয় কান্তি বা অঙ্গদ্যুতি। **জগত মাতায়**—আনন্দ-কিরণ বিচ্ছুরিত করিয়া সমস্ত জগদ্বাসীকে আনন্দোন্মত্ত করে।

শৃঙ্গাররস—মধুর রস, যাহা জগতের নারীবৃন্দকে উন্মত্ত করে। **তাতে**—সেই কান্তিতে। **ছানি**—ছাঁকিয়া। **শৃঙ্গার-রস তাতে ছানি**—ইন্দ্র-নীলমণির কান্তির তুল্য যেই কান্তি তরুণ-তমালের কান্তিকেও মনোরমতায় পরাজিত করে, এবং যে কান্তি সমস্ত জগৎকে আনন্দোন্মত্ত করিয়া থাকে, সেই অপূর্ব্ব কান্তিতে সর্ব্বচিত্তোন্মাদক শৃঙ্গার-রসকে ছাঁকিয়া। এইরূপে ছাঁকার ফলে শৃঙ্গাররস ইন্দ্রনীলমণির কান্তির সঙ্গে সর্ব্বতোভাবে মিশ্রিত হইয়া যায় এবং পরে অপর কোনও বস্তুর সঙ্গে ইহাকে মিলাইবারও সুবিধা হয়। অধিকন্তু উক্ত কান্তির মাদকতার সঙ্গে শৃঙ্গার-রসের মাদকতা মিশ্রিত হইয়া একটী অনির্ব্বচনীয় মাদকতাও উৎপন্ন হয়।

"শৃঙ্গাররস তাতে ছানি" স্থলে "শৃঙ্গার-রস-সার ছানি" পাঠান্তরও আছে। অর্থ—শৃঙ্গার-রসের সারকে (শ্রীরাধিকাদি ব্রজদেবীগণের সঙ্গে মদনমোহন শ্রীকৃষ্ণ যে রস আস্বাদন করেন, তাহাকে) উক্ত কান্তিতে ছাঁকিয়া।

তাতে—তাহাতে; তাহার সঙ্গে; সর্ব্বচিত্তোন্মাদিকা কান্তিতে ছাঁকা শৃঙ্গার-রসের সঙ্গে। **চন্দ্রজ্যোৎস্না**—চন্দ্রের জ্যোৎস্না। চন্দ্র-জ্যোৎস্নার স্নিগ্ধতা, চাকচিক্য, অন্ধকার-দূরীকরণত্ব, চিত্তের উল্লাস-জনকত্ব এবং সন্তাপ-হারিত্ব সর্ব্বজন-বিদিত। **সানি**—মিলাইয়া, মিশ্রিত করিয়া। **তাতে চন্দ্রজ্যোৎস্না সানি**—ইন্দ্রনীলমণির কান্তিতে ছাঁকা শৃঙ্গার-রসের সঙ্গে চন্দ্রের জ্যোৎস্না মিশ্রিত করিয়া। এই মিশ্রণের ফলে, অনির্ব্বচনীয় কান্তির ও শৃঙ্গার-রসের মাদকতার সঙ্গে চন্দ্রজ্যোৎস্নার স্নিগ্ধতা, চাকচিক্য, চিত্তের উল্লাসজনকত্ব এবং বিরহ-সন্তাপহারিত্ব মিশ্রিত হইয়াছে। **জানি**—যেন; বোধ হয়। **বিধি**—সৃষ্টিকর্ত্তা বিধাতা। **নিরমিল**—নির্ম্মাণ করিল। **তায়**—শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গকে। পূর্ব্ব ত্রিপদী-উক্ত কৃষ্ণতনু।

"জিনিয়া তমালদ্যুতি" হইতে "বিধি নিরমিল তায়" পর্য্যন্ত :—শ্রীকৃষ্ণতনুর অনির্ব্বচনীয় আকর্ষকত্বের কথা বলিতে বলিতে প্রভু আরও বলিলেন—"সখি! শ্রীকৃষ্ণতনুর অদ্ভুত আকর্ষণ-ক্ষমতার কথা ব্যক্ত করিবার ভাষা আমার নাই; শ্রীকৃষ্ণের শ্যামল-অঙ্গ-কান্তির তুলনাও জগতে পাওয়া যায় না; তরুণ তমালের স্নিগ্ধ-শ্যামল-কান্তিও ইহার নিকটে পরাভূত; শ্রীকৃষ্ণের কান্তির সঙ্গে ইন্দ্রনীলমণির কান্তির কিঞ্চিৎ সাদৃশ্য আছে বটে; কিন্তু ইহা ইন্দ্রনীলমণির কান্তি তো নহে; কারণ, ইন্দ্রনীলমণির কান্তি খুব মনোরম হইলেও সমস্ত জগৎকে উন্মত্ত করার মত মাদকতা তাহাতে নাই; আমার প্রাণবল্লভের অঙ্গকান্তি কিন্তু নিজের অনির্ব্বচনীয় শক্তিতে সমস্ত জগৎকে আনন্দোন্মত্ত করিয়া দেয়। ইহার আরও একটী অদ্ভুত শক্তি এই যে, যে নারী একবার শ্রীকৃষ্ণের এই শ্যামলকান্তি দর্শন করিবেন—সতী সাধ্বী বলিয়া তাঁহার যতই খ্যাতি থাকুক না কেন—তিনি তৎক্ষণাৎই স্বজন-আর্য্যপথাদি সমস্ত বিসর্জ্জন দিয়া, নিজাঙ্গ দ্বারা সেবা করিয়াও শ্রীকৃষ্ণকে সুখী করিবার নিমিত্ত উন্মত্তা হইয়া পড়িবেন। আর সখি! স্নিগ্ধতায়, চাকচিক্যে,

কাহাঁ সে মুরলীধ্বনি, নবাভ্রগর্জ্জিত জিনি,
জগদাকর্ষে শ্রবণে যাহার।
উঠি ধায় ব্রজজন, তৃষিত চাতকগণ,
আসি পিয়ে কান্ত্যমৃতধার॥ ৪০

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

উল্লাস-জনকত্বে এবং সন্তাপ-হারিত্বে শ্রীকৃষ্ণকান্তির সঙ্গে চন্দ্রজ্যোৎস্নারও কিঞ্চিৎ সাদৃশ্য আছে; কিন্তু সখি! এই স্নিগ্ধতাদি গুণ চন্দ্রজ্যোৎস্না অপেক্ষা শ্রীকৃষ্ণকান্তিতে যে কোটি কোটি গুণে অধিক, তাহাতেও কোনও সন্দেহ নাই। তাতে আমার মনে হয়, সখি! বিধাতার ভাণ্ডারে বুঝি সর্ব্বচিত্তের আনন্দোন্মত্ততা-জনক এমন একটী অনির্ব্বচনীয়া কান্তি ছিল—যাহার সঙ্গে ইন্দ্রনীলমণি-কান্তির কিঞ্চিৎ সাদৃশ্য আছে এবং যাহা তরুণ তমালের কান্তিকেও পরাজিত করিয়া থাকে। এই অনির্ব্বচনীয় কান্তিতে, শৃঙ্গার-রসকে ছাঁকিয়া, তাহার সঙ্গে চন্দ্রের জ্যোৎস্না মিশাইয়া বোধহয় বিধাতা এই অপরূপ কৃষ্ণতনু নির্ম্মাণ করিয়া থাকিবেন, সখি!"

৪০। এক্ষণে "ক মন্দ্রমুরলীরবঃ" অংশের অর্থ করিতেছেন, দুই ত্রিপদীতে।

কাহাঁ—কোথায়। **নবাভ্র**—নূতন মেঘ। **গর্জ্জিত**—গর্জ্জন, ডাক। **নবাভ্র-গর্জ্জিত জিনি**—শ্রীকৃষ্ণের মুরলীধ্বনি, মধুরতায় ও গাম্ভীর্য্যে নূতন মেঘের-ধ্বনিকেও পরাজিত করে। **জগদাকর্ষে** ইত্যাদি—যাহার (যে মুরলীধ্বনির) শ্রবণে (শ্রবণ করিলে) সমস্ত জগৎ আকৃষ্ট হয়।

উঠি ধায় ব্রজজন—যে মুরলীধ্বনি শুনিলে ব্রজবাসিগণ তৎক্ষণাৎ নিজ নিজ কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া ঐ শব্দকে লক্ষ্য করিয়া ধাবিত হয়। **তৃষিত চাতকগণ**—ব্রজজনরূপ তৃষিত চাতক। মেঘের গর্জ্জন শুনিলে বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা জানিয়া বৃষ্টিধারা পান করিবার নিমিত্ত পিপাসার্ত্ত চাতক যেমন ধাবিত হয়, শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনি শুনিলেও কৃষ্ণবিরহ-কাতর এবং শ্রীকৃষ্ণ-দর্শনের নিমিত্ত উৎকণ্ঠান্বিত (তৃষিত) ব্রজবাসিগণ সমস্ত কার্য্য ত্যাগ করিয়া বংশীধ্বনি লক্ষ্য করিয়া শ্রীকৃষ্ণের দিকে ধাবিত হয়েন।

পিয়ে—পান করে (ব্রজ জন)। **কান্ত্যমৃত-ধার**—শ্রীকৃষ্ণকান্তিরূপ অমৃত, কান্ত্যমৃত। কান্ত্যমৃতরূপ ধারা কান্ত্যমৃতধার। চাতক পক্ষী মেঘের বারিধারা পান করিয়া থাকে; তাই, চাতকের সঙ্গে ব্রজজনের তুলনা দেওয়ায়, বারিধারার সহিত শ্রীকৃষ্ণকান্তিরূপ অমৃতের তুলনা দেওয়া হইয়াছে।

চাতকের সঙ্গে ব্রজজনের তুলনা দেওয়ার তাৎপর্য্য এই যে, চাতক যেমন মেঘের জল ব্যতীত অপর কিছুই পান করে না, ব্রজবাসিগণও শ্রীকৃষ্ণের কান্তি (শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গ) ব্যতীত অপর কিছু দর্শন করিয়া তৃপ্তি পায়েন না।

তৃষিত-শব্দের তাৎপর্য্য এই যে, মেঘের অভাব হইলে চাতক যেমন পিপাসায় কাতর হইয়া যায়, সুতরাং মেঘের আগমনের নিমিত্ত উৎকণ্ঠিত হইয়া থাকে; তদ্রূপ গোচারণাদির নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণ অন্যত্র গমন করিলে, ব্রজবাসিগণও তাঁহার অদর্শনে অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়েন এবং তাঁহার আগমন-প্রতীক্ষায় অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হইয়া থাকেন।

শ্রীকৃষ্ণকান্তিকে অমৃত (কান্ত্যমৃত) বলার সার্থকতা এই যে, অমৃত সিঞ্চিত হইলে যেমন মৃত ব্যক্তির দেহে প্রাণসঞ্চার হয়; তদ্রূপ কৃষ্ণকান্তি দর্শন করিলেও, তাঁহার বিরহে মৃতপ্রায় ব্রজবাসিগণের দেহে যেন নূতন প্রাণের সঞ্চার হয়।

"কাহাঁ সে মুরলীধ্বনি" হইতে "কান্ত্যমৃতধার" পর্য্যন্ত:—"হায় সখি! কোথায় এখন আর শ্রীকৃষ্ণের সেই মুরলীধ্বনি—যাহার মধুরতা এবং গাম্ভীর্য্যের নিকটে নবমেঘের গর্জ্জনও পরাভূত! ওঃ! কি অদ্ভুত আকর্ষণ-শক্তি ছিল সেই মুরলীধ্বনির! সমস্ত জগৎকে যেন বলপূর্ব্বক আকর্ষণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের নিকটে লইয়া আসিত! আর ব্রজজনের কথা কি আর বলিব সখি! তোমরা তো সমস্তই জান। মেঘের অভাবে চাতক যেমন পিপাসায়

মোর সেই কলানিধি, প্রাণরক্ষা-মহৌষধি,
সখি ! মোর তেঁহো সুহৃত্তম।
দেহ জীয়ে তাঁহা বিনে, ধিক্ এই জীবনে,
বিধি করে এত বিড়ম্বন ॥ ৪১

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

ছট্‌ফট্ করিতে থাকে, মেঘোদয়ের প্রতীক্ষায় উৎকণ্ঠিত হইয়া থাকে—গোচারণাদির ব্যপদেশে শ্রীকৃষ্ণ যখন ব্রজবাসিগণের দৃষ্টির অন্তরালে যাইতেন, তখন তাঁহারাও শ্রীকৃষ্ণবিরহ-কাতরতায় মৃতপ্রায় হইয়া পড়িতেন এবং শ্রীকৃষ্ণ-দর্শনের উৎকণ্ঠায় তাঁহাদের প্রাণ যেন তখন ছট্‌ফট্ করিতে থাকিত। আবার নূতন মেঘের গর্জ্জন শুনিলে জলপ্রাপ্তির আশায় তৃষিত চাতক যেমন ঐ গর্জ্জনকে লক্ষ্য করিয়াই মেঘের পানে ছুটিতে থাকে, তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনি শুনিয়াও শ্রীকৃষ্ণের আগমন-সম্ভাবনায়, উৎকণ্ঠিত ব্রজবাসিগণ বংশীধ্বনি লক্ষ্য করিয়া দ্রুতবেগে ধাবিত হইতেন; শ্রীকৃষ্ণের দর্শন পাইলেই যেন তাঁহাদের মৃতপ্রায় দেহে পুনর্জীবনের লক্ষণ প্রকাশ পাইত—জ্যৈষ্ঠ মাসের মধ্যাহ্ন-সময়ে মরুভূমিতে ভ্রমণরত পিপাসার্ত্ত পথিক যেরূপ উৎকণ্ঠার সহিত অকস্মাৎপ্রাপ্ত জল পান করিতে থাকে, তাঁহারাও তদ্রূপ ঔৎসুক্যের সহিত অপলক দৃষ্টিতে শ্রীকৃষ্ণরূপ দর্শন করিয়া পরিতৃপ্ত হইতেন। সখি! শ্রীকৃষ্ণের অদর্শনে—তৃষিত চাতকের ন্যায়, মরুভূমিতে ভ্রমণরত পথিকের ন্যায়—শ্রীকৃষ্ণরূপ-সুধার পিপাসায় আমারও প্রাণ ছট্‌ফট্ করিতেছে—সখি! প্রাণবল্লভের কান্ত্যমৃত পানের সৌভাগ্য আমার কখন হইবে? কখন আমি সেই মদনমোহনের মোহন-মুরলীধ্বনি শুনিয়া তাঁহার সহিত মিলিত হওয়ার উদ্দেশ্যে উন্মত্তার ন্যায় ধাবিত হইব?"

৪১। **কলা**—নৃত্যগীতাদি। **নিধি**—আশ্রয়। **কলানিধি**—নৃত্যগীতাদির আশ্রয়, নৃত্যগীতাদিতে সর্ব্বাপেক্ষা নিপুণ যিনি; রাসরসতাণ্ডবী। **মোর সেই কলানিধি**—সখি! যিনি নৃত্য-গীতাদি-নিপুণতার আশ্রয়ীভূত, রাসরসতাণ্ডবী আমার সেই প্রাণবল্লভ কোথায়? ইহা শ্লোকস্থ "ক রাস-রসতাণ্ডবী" অংশের অর্থ।

প্রাণরক্ষা-মহৌষধি—যিনি আমার প্রাণরক্ষার মহৌষধি-তুল্য। শ্রীকৃষ্ণবিরহে শ্রীরাধার প্রাণ বহির্গত হইতেছে, শ্রীকৃষ্ণকে না দেখিলে প্রাণরক্ষার আর অন্য উপায় নাই; তাই শ্রীকৃষ্ণকে তাঁহার প্রাণরক্ষা সম্বন্ধে মহোপকারক ঔষধরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ-বিরহ-পীড়ায়, শ্রীকৃষ্ণরূপই একমাত্র ফলদায়ক ঔষধ। ইহা "ক সখি জীবরক্ষৌষধি" অংশের অর্থ।

সখি! মোর তেহোঁ সুহৃত্তম—সখি! সেই শ্রীকৃষ্ণই আমার সর্ব্বাপেক্ষা অন্তরঙ্গ বন্ধু, তিনি এখন কোথায় সখি! ইহা শ্লোকস্থ "স মে সুহৃত্তমঃ ক" অংশের অর্থ।

কোনও কোনও গ্রন্থে মূল শ্লোকের "সুহৃত্তম ক বত" স্থানে "সুহৃত্তম ক তব" পাঠ দিয়া এই ত্রিপদীতে "মোর তেঁহো সুহৃত্তম" স্থলে "তোর তেঁহ সুহৃত্তম" পাঠ দেওয়া হইয়াছে। "তোর তেঁহ" পাঠস্থলে অর্থ বোধ হয় এইরূপ হইবে—"সখি! সেই শ্রীকৃষ্ণ তোর সর্ব্বাপেক্ষা অন্তরঙ্গ বন্ধু; তাই, তুই বোধহয় জানিস্ তিনি কোথায় আছেন; সখি! আমায় একবার বলিয়া দে, তিনি কোথায় আছেন।"

এই অংশের মর্ম্ম:—"সখি! নৃত্যগীতবিশারদ আমার সেই রাসরসতাণ্ডবী প্রাণবল্লভ কোথায়? তাঁহার বিরহে আমার যে প্রাণ যায়, সখি! একবার তাঁকে দেখা সখি! দেখাইয়া আমার প্রাণ বাঁচা সখি! তাঁকে না দেখিলে আমি আর বাঁচিতে পারি না সখি! তিনিই আমার জীবনরক্ষার একমাত্র মহৌষধি। সখি! তোরা তো জানিস্ তাঁর মত সুহৃৎ আমার আর কেহই নাই—তাঁহার বিরহে আমার হৃদয়ের অবস্থা কিরূপ হইয়াছে, তা কি তিনি জানিতে পারেন না, সখি! তবে কেন তিনি এখনও আমাকে দেখা না দিয়া দূরে বসিয়া আছেন? কেন একবার আসিয়া আমার প্রাণরক্ষা করেন না?"

দেহ—আমার শরীর। **জীয়ে**—জীবিত থাকে। **তাঁহা বিনে**—সেই শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত। **দেহ জীয়ে তাঁহা বিনে**—"যিনি আমার প্রাণরক্ষার একমাত্র মহৌষধি, তাঁহাকে না পাইয়াও আমার এই দেহ জীবিত আছে!

যে জন জীতে নাহি চায়, তারে কেনে জীয়ায়,
বিধিপ্রতি উঠে ক্রোধ-শোক।
বিধির করে ভৎর্সন, কৃষ্ণে দেয় ওলাহন,
পঢ়ি ভাগবতের এক শ্লোক॥ ৪২

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

কি আশ্চর্য্য!" ইহা শ্লোকস্থ "নিৰ্ঘিৰ্ম্ম" অংশের অর্থ। **ধিক্ এই জীবনে**—"আমার এই জীবনেও ধিক্ সখি!" ইহা শ্লোকস্থ "বত হন্ত" অংশের অর্থ। **বিধি করে এত বিড়ম্বন**—"বিধাতা আমার সঙ্গে এত প্রতারণা করেন! শ্রীকৃষ্ণকে ও আমাকে এমন ভাবেই বিধাতা সৃষ্টি করিলেন যে, শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত আমার জীবন-ধারণই অসম্ভব; এই অবস্থায়, বিধাতা যদি শ্রীকৃষ্ণকে আমার নিকটে রাখিতেন, তাহা হইলেই বুঝিতাম, বিধাতা আমার সঙ্গে সরল ব্যবহার করিতেছেন; অথবা, শ্রীকৃষ্ণকে আমার নিকট হইতে দূরে সরাইয়া বিধাতা যদি আমাকে বাঁচিতে না দিতেন, তাহা হইলেও তাঁর সরলতা বুঝা যাইত। কিন্তু আমার জীবন-রক্ষার যিনি একমাত্র মহৌষধ, তাঁহাকে আমার নিকট হইতে সরাইয়া নেওয়া, এবং তাঁহাকে সরাইয়া নিয়াও আমাকে জীবিত রাখা—আমি বাঁচিতে ইচ্ছা না করিলেও আমাকে বাঁচাইয়া রাখা—এসমস্ত বিধাতার সরল ব্যবহারের পরিচায়ক নহে: বুঝিতেছি, আমাকে নানা প্রকারে বিড়ম্বিত করাই বিধাতার অভিপ্রায়। তিনি সৃষ্টিকর্ত্তা, আমি তাঁর সৃষ্টজীব; আমার সঙ্গে তাঁহার এইরূপ প্রতারণা কি সঙ্গত? ধিক্ বিধিকে।" ইহা শ্লোকস্থ "ধিগ্‌ধিং" অংশের অর্থ।

৪২। **জীতে**—জীবিত থাকিতে; বাঁচিতে। **জীয়ায়**—বাঁচাইয়া রাখে। **যে জন জীতে** ইত্যাদি—যে বাঁচিতে ইচ্ছা করে না, বিধি তাকে বাঁচাইয়া রাখে কেন? ইহাকে বিধাতার বিড়ম্বনা ব্যতীত আর কি বলা যায়।

এই পর্য্যন্ত রাধাভাবাবিষ্ট প্রভুর উক্তি। **বিধি প্রতি**—বিধাতার প্রতি। **উঠে ক্রোধ শোক**—বিধাতার প্রতি রাধাভাবাবিষ্ট প্রভুর ক্রোধ এবং কৃষ্ণ-বিরহে শোক। নিজের প্রতি বিধাতার বিড়ম্বনার কথা ভাবিয়া রাধা-ভাবাবিষ্ট প্রভু বিধাতার প্রতি অত্যন্ত রুষ্ট হইলেন এবং শ্রীকৃষ্ণ-বিরহ-জনিত শোকে অত্যন্ত অভিভূত হইলেন।

"বিধিপ্রতি উঠে ক্রোধশোক" ইহা গ্রন্থকারের উক্তি।

বিধিরে করে ভৎর্সন—বিধাতা তাঁহাকে বিড়ম্বিত করিতেছেন বলিয়া রাধাভাবাবিষ্ট প্রভু তাঁহাকে তিরস্কার করিলেন। বিধাতাকে কিরূপে তিরস্কার করিলেন, তাহা নিম্নোদ্ধৃত "অহো বিধাতঃ" ইত্যাদি শ্লোক এবং তৎপরবর্ত্তী ত্রিপদী-সমূহে কথিত হইয়াছে।

ওলাহন—প্রণয়-মূলক মৃদুভৎর্সন। **কৃষ্ণে দেয় ওলাহন**—"যিনি আমার প্রাণবল্লভ, যিনি কতকাল আমার সঙ্গে একত্র অবস্থান করিয়াছেন, সেই কৃষ্ণ আমার প্রতি এরূপ নিষ্ঠুরতা করিলেন? স্বজন-আর্য্যপথাদি সমস্ত ত্যাগ করিয়া আমি যাঁকে সুখী করার জন্য ব্যস্ত, সেই কৃষ্ণ নিজ হাতে আমাকে মারিতে উদ্যত?"—ইত্যাদি বলিয়া শ্রীকৃষ্ণকে ওলাহন দিতে লাগিলেন। পরবর্ত্তী ত্রিপদী-সমূহে ওলাহনের কথাগুলি দেওয়া আছে।

পঢ়ি ভাগবতের এক শ্লোক—নিম্নোদ্ধৃত "অহো বিধাতঃ" ইত্যাদি ভাগবতীয় শ্লোকটী পড়িয়া প্রলাপে তাহার মর্ম্ম প্রকাশ করিয়া বিধাতাকে ভৎর্সনা করিতে এবং শ্রীকৃষ্ণকে ওলাহন দিতে লাগিলেন।

কেহ কেহ বলেন "ব্রজেন্দ্র-কুল-দুগ্ধ-সিন্ধু" ইত্যাদি প্রলাপটী চিত্রজল্পের অন্তর্গত পরিজল্পের দৃষ্টান্ত। আমাদের কিন্তু তাহা মনে হয় না। কারণ, ইহাতে চিত্রজল্পের সাধারণ লক্ষণ নাই। (৩।১৫।২১ ত্রিপদীর টীকার শেষাংশ দ্রষ্টব্য।) আবার ইহাতে পরিজল্পের বিশেষ লক্ষণও নাই; পরিজল্পে শ্রীকৃষ্ণের নির্দ্দয়তা, শঠতা ও চাপল্যাদির প্রতিপাদন এবং শ্রীরাধার নিজের বিচক্ষণতার প্রকাশ থাকে (উঃ নীঃ স্থাঃ ১৪২)। উক্ত প্রলাপে এসমস্ত কিছু নাই—আছে, শ্রীকৃষ্ণের রূপ-গুণাদির স্মরণে তাঁহার সহিত মিলনের নিমিত্ত শ্রীরাধার বলবতী উৎকণ্ঠা এবং তাঁহার বিরহেও শ্রীরাধা বাঁচিয়া রহিয়াছেন বলিয়া নিজের জীবনের প্রতি ধিক্কার। এই প্রলাপে দিব্যোন্মাদের ভ্রমাভা-বৈচিত্রীও দেখা যায় না। ইহা মোহনাখ্য ভাবের অপর একটা বৈচিত্রী বলিয়াই মনে হয়।

তথাহি (ভাঃ ১০।৩৯।১৯)—

অহো বিধাতস্তব ন ক্বচিদ্দয়া
সংযোজ্য মৈত্র্যা প্রণয়েন দেহিনঃ।
তাংশ্চাকৃতার্থান্ বিযুনঙ্‌ক্ষ্যপার্থকং
বিচেষ্টিতং তেঽর্ভকচেষ্টিতং যথা॥ ৩॥

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

শ্রীকৃষ্ণসঙ্গতিং বিধায় বিঘটয়তীতি বিধাতারং প্রত্যেবমাক্রোশন্ত্য আহুঃ অহো ইতি। মৈত্র্যা হিতাচরণেন প্রণয়েন স্নেহেন চ। অকৃতার্থান্ অপ্রাপ্তভোগানপি বিযুনক্ষি বিযোজয়সি তস্মান্নতাবদ্দয়া বালিশোঽপিত্বম্ ইত্যাহুঃ অপার্থকমিতি। স্বামী। ৩

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

শ্লো। ৩। অন্বয়। অহো (অহো কি আশ্চর্য্য)! বিধাতঃ (হে বিধাতঃ)! তব (তোমার) ক্বচিৎ (কোথাও) দয়া ন (দয়া নাই), [যতঃ] (যেহেতু) মৈত্র্যা (মৈত্রীদ্বারা) প্রণয়েন (প্রণয়দ্বারা) দেহিনঃ দেহীদিগকে, (জীবদিগকে) সংযোজ্য (সংযুক্ত করিয়া) অকৃতার্থান্ তান্ (তাহারা কৃতার্থ না হইতেই, তাহাদের মনোরথ পূর্ণ না হইতেই তাহাদিগকে) বিযুনক্ষি (বিযুক্ত কর তুমি); তে (তোমার) বিচেষ্টিতম্ (চেষ্টা, কার্য্য) অর্ভকচেষ্টিতম্ (বালকের চেষ্টার ন্যায়) :অপার্থকম্ (অর্থশূন্য)।

অনুবাদ। গোপীগণ বলিলেন—অহো কি আশ্চর্য্য! হে বিধাতঃ! কোথাও তোমার দয়ার লেশমাত্র নাই; যেহেতু, মৈত্রী ও প্রণয়দ্বারা জীবগণকে সংযুক্ত করিয়া তাহাদের মনোরথ পূর্ণ না হইতেই তুমি তাহাদিগকে বিযুক্ত কর। বুঝিলাম, তোমার চেষ্টা বালকের চেষ্টার ন্যায় অর্থশূন্য। ৩

অক্রূর ব্রজে আসিয়াছেন– শ্রীকৃষ্ণকে মথুরায় নেওয়ার জন্য। ব্রজসুন্দরীগণ তাহা জানিতে পারিলেন; জানিয়া শ্রীকৃষ্ণবিরহের আশঙ্কায় কাতর হইয়া পড়িলেন। তাঁহারা তাঁহাদের এই দুর্ভাগ্যের জন্য বিধাতাকেই দোষী মনে করিয়া এই শ্লোকোক্ত কথায় তাঁহাকে ভর্ৎসনা করিতেছেন।

হে বিধাতঃ! কোথাও কিঞ্চিন্মাত্র দয়াও তোমার নাই; তাহার প্রমাণ দিতেছি, শুন। মৈত্রীদ্বারা বা প্রণয়দ্বারা তুমি লোকদিগকে একত্রিত (মিলিত) কর। তোমার এই আচরণকে হয়তো তোমার দয়ার কার্য্য বলিয়াই তুমি মনে করিবে; যেহেতু তুমি বলিবে—তাহাদিগকে মিলিত করিয়া মিলন-সুখ উপভোগের সুযোগ তুমি তাদের করিয়া দিলে। কিন্তু কার্য্যের শেষটা দেখিয়াই উদ্দেশ্যের বা প্রবর্ত্তক-বাসনার স্বরূপ নির্ণয় করিতে হয়। তোমার কার্য্যের শেষটা দেখিলে প্রেম-মৈত্রী দ্বারা লোকের একত্রীকরণকেও তোমার দয়ার কার্য্য বলিয়া মনে করা যায় না। কারণ, দেখা যাইতেছে—লোকদিগকে প্রেম-মৈত্রীদ্বারা একত্রিত করিয়াও, তাহাদিগকে মিলন-সুখ উপভোগ করার সুযোগ দিয়াও—তুমি তাহাদিগকে মিলনসুখ ভোগ করিতে দাও না; সুখ-ভোগের আরম্ভেই, তাহাদের ভোগবাসনা পূর্ণ না হইতেই **অকৃতার্থান্ তান্**—তাহারা অকৃতার্থ থাকিতেই, সুখভোগে তাহাদের কৃতার্থতা—সার্থকতা লাভ করার পূর্ব্বেই তুমি তাহাদিগকে **বিযুনক্ষি**—বিযুক্ত কর, পরস্পরের নিকট হইতে দূরে সরাইয়া লও; ইহা কি তোমার দয়ার কাজ? পিপাসাতুর লোকের হাতে জলপাত্র দিয়া, যখনই সে তাহাতে ওষ্ঠ স্পর্শ করাইয়াছে, তখনই তাহার হাত হইতে জলপাত্র কাড়িয়া নেওয়া কি দয়ার কাজ? ইহা অপেক্ষা নির্ম্মমতা আর কি হইতে পারে? কৃষ্ণের সহিত তুমি আমাদের মিলন ঘটাইয়াছ; কিন্তু কয়দিনের জন্য? সবেমাত্র আমরা মিলনানন্দ উপভোগ করিবার উদ্যোগ করিতেছি—তখনই তুমি অক্রূরকে পাঠাইয়া আমাদের সান্নিধ্য হইতে কৃষ্ণকে দূরে সরাইয়া নিতেছ? বিধি! পূর্ব্বাপর বিবেচনা করিয়া কাজ করিতে তুমি জান না। বালক যেমন যখন যাহা মনে আসে, তাহাই তখন করিয়া থাকে—ভাবিয়া চিন্তিয়া কিছুই করে না, তোমার অবস্থাও তদ্রূপ। বালকের কার্য্যের যেমন কোনও উদ্দেশ্য বা অর্থ থাকে না, তোমার কার্য্যও তদ্রূপ; তোমার **বিচেষ্টিতং**—চেষ্টা, কার্য্য **অর্ভক-**

অস্যার্থঃ যথারাগঃ—
না জানিস্ প্রেম-ধর্ম্ম, ব্যর্থ করিস্ পরিশ্রম,
তোর চেষ্টা বালক-সমান।
তোর যদি লাগ পাইয়ে, তবে তোরে শিক্ষা দিয়ে,
এমন যেন না করিস্ বিধান॥ ৪৩

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

চেষ্টিতম্—অর্ভকের (বালকের, শিশুর) চেষ্টার ন্যায় **অপার্থক**—অপগত হইয়াছে অর্থ (উদ্দেশ্য) যাহা হইতে; উদ্দেশ্যহীন, অর্থশূন্য। **অহো**—কি আশ্চর্য্য! তুমি বিধাতা, জগতের ভাগ্যনিয়ন্তা; অথচ তোমার এরূপ আচরণ! ইহা অপেক্ষা আশ্চর্য্যের বিষয় আর কি হইতে পারে?

পরবর্ত্তী ত্রিপদী-সমূহে এই শ্লোকের তাৎপর্য্য বিবৃত হইয়াছে।

৪৩। এই ত্রিপদীসমূহে "অহো বিধাতঃ" ইত্যাদি শ্লোকের অর্থ করিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণকে মথুরায় নেওয়ার জন্য অক্রূর যখন ব্রজে আগমন করিয়াছিলেন, সেই সময়েই গোপীগণ "অহো বিধাতঃ" ইত্যাদি শ্লোকে বিধাতাকে নিন্দা করিয়াছিলেন। সেই সময়ে গোপীদিগের মনে যে ভাবের উদয় হইয়াছিল, সম্ভবতঃ সেই ভাবের আবেশেই শ্রীমন্মহাপ্রভু এই শ্লোকটী পড়িয়া প্রলাপে তাহার তাৎপর্য্য ব্যক্ত করিতেছিলেন। উক্ত শ্লোক-কথনকালে গোপীদিগের ছিল শ্রীকৃষ্ণের ভাবী বিরহের—শ্রীকৃষ্ণ অক্রূরের সঙ্গে চলিয়া গেলে তাঁহাদের যে দুঃখ হইবে, সেই ভাবী দুঃখের আশঙ্কার ভাব; কিন্তু পরবর্ত্তী ত্রিপদীসমূহ হইতে বুঝা যায়—শ্রীকৃষ্ণ মথুরায় চলিয়া গিয়াছেন পরে গোপীদের বা শ্রীরাধার মনে যে ভাব জন্মিয়াছিল, তখন শ্রীরাধা যে ভাবের বশীভূত হইয়া বিধাতাকে ভৎর্সনা করিতেছিলেন, সেই ভাবের আবেশেই উক্ত শ্লোকোক্ত কথায় প্রভুও বিধাতাকে তিরস্কার করিয়াছেন। সম্ভবতঃ অক্রূরের আগমনে শ্রীকৃষ্ণের মথুরাগমন নিশ্চিত জানিয়া কৃষ্ণ-বিরহকে নির্দ্ধারিত মনে করিয়া ভাবী বিরহকেই বর্ত্তমানতুল্য জ্ঞানে রাধাভাবাবিষ্ট প্রভু এরূপ বলিয়াছেন।

"বিচেষ্টিতং তেঽর্ভকচেষ্টিতং যথা" এই অংশের অর্থ করিতেছেন "না জানিস্" ইত্যাদি বাক্যে।

না জানিস্—বিধি তুই জানিস্ না। বিধাতার নিজের কার্য্যে তাঁহার সম্পূর্ণ অক্ষমতা বিবেচনা করিয়া ক্রোধবশতঃ বিধাতার প্রতি তুচ্ছার্থবোধক "জানিস্"-শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। **প্রেম-ধর্ম্ম**—প্রেমের নিগূঢ় তত্ত্ব। **ব্যর্থ করিস্ পরিশ্রম**—বিধি, অজ্ঞতাবশতঃ তুই তোর পরিশ্রমকে ব্যর্থ করিতেছিস্। তুই প্রেমের নিগূঢ় তত্ত্বই জানিস্ না; অথচ প্রেমিক-যুগলের পরস্পরের প্রতি ব্যবহারের বিধানও করিতেছিস্; কিন্তু তোর অজ্ঞতাবশতঃ তোর বিহিত বিধান প্রেমিক-যুগলের প্রেমের প্রতিকূলই হইতেছে; তাতে, প্রেমিক-যুগলের আচরণের বিধান-প্রণয়নে তুই যে পরিশ্রম করিয়াছিস্, তাহা সম্যক্‌রূপে ব্যর্থই (নিস্ফল) হইতেছে।

তোর চেষ্টা বালক-সমান—বিধি, তোর চেষ্টা অজ্ঞ-বালকের চেষ্টার তুল্যই নিরর্থক হইতেছে। কিরূপে ঘর তৈয়ার করিতে হয়, বালক তাহা জানে না। না জানিলেও, বালক নিজের খেয়ালমত খেলার ঘর তৈয়ার করে এবং তাহাকে রক্ষা করার জন্য চেষ্টা করে; কিন্তু তাহার অজ্ঞতাবশতঃ তাহার কোনও কার্য্যই তাহার ঘর রক্ষার অনুকূল হয় না, ফলতঃ তাহার ঘরখানা পড়িয়াই যায়, বাসের উপযোগী হয় না। সুতরাং বালকের সমস্ত পরিশ্রমও বৃথা হইয়া যায়। বিধাতঃ, প্রেমিক-যুগলের পরিচালনার্থ বিধান-প্রণয়নে তোর পরিশ্রমও বালকের গৃহ-রক্ষণে পরিশ্রমের ন্যায়ই ব্যর্থ।

তোর যদি লাগ পাইয়ে—যদি তোকে (বিধিকে) আমার নিকটে পাইতাম। **তবে তোরে শিক্ষা দিয়ে**—তাহা হইলে তোকে আমি রীতিমত শিক্ষা দিয়া দিতাম (উপযুক্ত শাস্তি দিতাম)। **এমন যেন না করিস্ বিধান**—যাতে তুই আর কখনও প্রেমিক-যুগলের নিমিত্ত এইরূপ অদ্ভুত বিধান না করিস্। তোকে এমন শাস্তি দিতাম, যাহার ভয়ে তুই ভবিষ্যতে আর এমন গর্হিত কর্ম্ম করিতিস্ না। **বিধান**—ব্যবস্থা, যাতে প্রেমিক-যুগল পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া থাকে, এমন অকরুণ বিধান।

অরে বিধি! তোঁ বড় নিঠুর।
অন্যোন্যদুর্লভ জন, প্রেমে করাঞা সম্মিলন,
অকৃতার্থান্ কেনে করিস্ দূর ? ॥ ধ্রু ॥ ৪৪

অরে বিধি! অকরুণ, দেখাইয়া কৃষ্ণানন,
নেত্র-মন লোভাইলি আমার।
ক্ষণেক করিতে পান, কাঢ়ি নিলি অন্যস্থান,
পাপ কৈলে দত্ত-অপহার ॥ ৪৫

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

"না জানিস্" হইতে "করিস্ বিধান" পর্য্যন্তঃ—বিধাতার কার্য্য-কলাপে রুষ্ট হইয়া শ্রীরাধার ভাবে মহাপ্রভু বিধাতাকে ভৎ'সনা করিয়া বলিতেছেন :—"বিধি! তোর ধৃষ্টতা দেখিয়া ক্রোধে শরীর যেন জলিয়া যাইতেছে। যে যে-বিষয়ের বিধিব্যবস্থা নির্দ্ধারণ করিবে, সে বিষয়ে তাহার বিশেষ অভিজ্ঞতা থাকা একান্ত দরকার। তুই প্রেমের নিগূঢ় তত্ত্ব কিছুই জানিস্ না ; অথচ, তোর এতবড় ধৃষ্টতা যে, তুই প্রেমিক-যুগলের পরিচালনের নিমিত্ত—প্রেমিক-যুগল পরস্পরের প্রতি কিরূপ ব্যবহার করিবে, তদ্বিষয়ক—বিধিব্যবস্থা প্রণয়ন করিতেছিস্!! তোর এই অজ্ঞতামূলক-ধৃষ্টতার ফল হইতেছে এই যে, তোর বিধি-ব্যবস্থা সমস্তই প্রেমের প্রতিকূল হইতেছে। প্রেমিক-যুগলকে যদি প্রেমের অনুকূল অবস্থায়—একই সঙ্গে—রাখার ব্যবস্থা করিতে পারিতিস্, তাহা হইলেই বিধি-প্রণয়নের পরিশ্রম তোর সার্থক হইত। কিন্তু তোর ব্যবস্থার ফলে প্রেমিক-যুগল পরস্পরের নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া অপরিসীম দুঃখ-সাগরে নিমগ্ন হইয়াছে- প্রেমের প্রতিকূল অবস্থায় জীবন যাপন করিতেছে। প্রিয়ের বিরহে প্রিয়া কখনও জীবনধারণ করিতে ইচ্ছা করে না—সে প্রাণত্যাগ করিতেই উৎকণ্ঠিত হয়—ইহাই প্রেমের অনুকূল অবস্থা ; কিন্তু তোর উল্টা বিধির ফলে কান্তকর্তৃক পরিত্যক্তা হইয়াও কান্তাকে বাঁচিয়া থাকিতে হয়!! ধিক্ তোর বিধিকে, আর ধিক্ বিধি তোকে! গৃহনির্ম্মাণের এবং গৃহরক্ষার কৌশলে অনভিজ্ঞ বালকের চেষ্টায় যেমন তাহার নির্ম্মিত গৃহ কখনও বাসের উপযোগী এবং স্থায়ী হইতে পারে না, সুতরাং বালকের অজ্ঞতার ফলে, গৃহ-রক্ষাব্যপারে তাহার সমস্ত চেষ্টাই যেমন ব্যর্থ হইয়া যায়, প্রেমিক-প্রেমিকার পরিচালনার্থ বিধি-প্রণয়নে—প্রেমের গূঢ়তত্ত্বে সম্যক্রূপে অনভিজ্ঞ তোর চেষ্টাও তদ্রূপ সম্পূর্ণ রূপে ব্যর্থ হইয়াছে। যদি তোকে আমি কখনও একবার আমার নিকটে পাইতাম, তাহা হইলে তোকে এমন শিক্ষা (উপযুক্ত শাস্তি) দিতাম যে, ভবিষ্যতে তুই আর কখনও প্রেমিক-প্রেমিকার জন্য এমন অদ্ভুত বিধি প্রণয়ন করিতে সাহস করিতিস্ না।"

৪৪। **তোঁ**—তুমি, তুই। **নিঠুর**—নিষ্ঠুর, নির্দ্দয়। **অরে বিধি! তোঁ বড় নিঠুর**—রে বিধি! তুই অত্যন্ত নিষ্ঠুর। ইহা "অহো বিধাতস্তব ন ক্বচিদ্দয়া" অংশের অর্থ। **অন্যোন্যদুর্ল্লভ জন**—যাঁহারা পরস্পরের পক্ষে দুর্ল্লভ, এমন দুইজনকে। শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে দুর্ল্লভ, আবার শ্রীকৃষ্ণও শ্রীরাধার পক্ষে দুর্ল্লভ ; যেহেতু, শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে পরনারী। এই অবস্থায় শ্রীরাধাকৃষ্ণকে "অন্যোন্যদুর্ল্লভ জন" বলা হয়। **দুর্ল্লভ**—সহজে যাহা লাভ করা যায় না। প্রেম-ব্যতীত অন্য উপায়ে দুর্ল্লভ। **প্রেমে করাঞা সম্মিলন**—প্রেমের দ্বারা অন্যোন্য দুর্ল্লভজনকে সম্মিলিত করিয়া। **অকৃতার্থান্**—অপূর্ণবাসনা ; তাঁহাদের পরস্পরের সঙ্গ-বাসনা পূর্ণ না হইতেই। **কেনে করিস্ দূর**—প্রেমের প্রভাবে সম্মিলিত অন্যোন্য-দুর্ল্লভজনকে কেন পরস্পরের নিকট হইতে দূর (বিচ্ছিন্ন) করিস্?

"বিধি! তুই যে কেবল অজ্ঞ এবং ধৃষ্ট, তাহাই নহে, তুই নিতান্ত নিষ্ঠুরও ; তোর প্রাণে দয়া-মায়া নাই। তাহাই যদি না হইবে, তবে প্রেমব্যতীত অন্য কোনও উপায়েই যাঁহাদের পরস্পরের সহিত সম্মিলনের কোনও সম্ভাবনাই নাই, এমন দুইজনকে প্রেমের দ্বারা সম্মিলিত করিয়া—পরস্পরের সঙ্গে তাঁহাদের অভীষ্ট সম্ভোগাদি শেষ না হইতেই তুই তাঁহাদিগকে পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন করিলি কেন ? এমন নিষ্ঠুর তুই ?"

"অন্যোন্যদুর্ল্লভ" ইত্যাদি "সংযোজ্য মৈত্র্যা........বিযুনঙক্ষ্যপার্থকং" অংশের অর্থ।

৪৫। প্রেমের দ্বারা তাঁহাদের সংযোগ করিয়া কিরূপে বিধি আবার তাঁহাদের বিচ্ছেদ ঘটাইলেন, তাহাই বিশেষ করিয়া বলিতেছেন।

'অক্রূর করে তোমার দোষ, আমায় কেনে কর রোষ,
ইহা যদি কহ দুরাচার।
তুঞি অক্রূরমূর্ত্তি ধরি, কৃষ্ণে নিলি চুরি করি,
অন্যের নহে ঐছে ব্যবহার॥ ৪৬

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

অকরুণ—করুণাশূন্য, নিষ্ঠুর। **কৃষ্ণানন**—শ্রীকৃষ্ণের মুখ। **নেত্র-মন লোভাইলি আমার**—আমার নয়নের ও মনের লোভ জন্মাইলি। শ্রীকৃষ্ণের বদনমাধুর্য্য দেখিবার নিমিত্ত আমার নয়নের এবং তাঁহার সহিত মিলিত হইবার নিমিত্ত আমার মনের লোভ জন্মাইলি। শ্রীকৃষ্ণের প্রতি আমার প্রেম জন্মাইলি—যেই প্রেমের দ্বারা তুই শ্রীকৃষ্ণের সহিত আমার মিলন করাইলি। এস্থলে, পূর্ব্বত্রিপদী-প্রোক্ত "প্রেমে করাঞা সম্মিলন" অংশ স্পষ্ট করিয়া বলিলেন।

এক্ষণে কিরূপে "অকৃতার্থ-প্রেমিক-যুগলকে বিচ্ছিন্ন" করিয়া বিধাতা নিজের নিষ্ঠুরত্বের পরিচয় দিয়াছেন, তাহা বলা হইতেছে।

ক্ষণেক করিতে পান—শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলনের পরে তাঁহার বদন-চন্দ্রের সুধা অল্পক্ষণ মাত্র পান করার পরেই; ইচ্ছামত তাঁহার বদন-সুধা (বা সঙ্গ-সুধা) পান করার পূর্ব্বেই। **কাড়ি নিলি অন্য স্থান**—বলপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণকে আমার নিকট হইতে অন্য স্থানে লইয়া গেলি। **দত্ত-অপহার**—কোনও বস্তু একবার দিয়া পুনরায় তাহা কাড়িয়া নেওয়াকে দত্ত-অপহার বলে। ইহা একটি পাপ। **পাপ কৈলে** ইত্যাদি—শ্রীকৃষ্ণকে তুই একবার আমাকে দিলি; দিয়াই আবার অল্পক্ষণ পরে কাড়িয়া নিলি; ইহাতে যে তোর কেবল নিষ্ঠুরতা হইয়াছে, তাহাই নহে; দত্তাপহার-জনিত পাপও তোর হইয়াছে। তুই নিষ্ঠুর, তুই পাপী।

"অরে বিধি" হইতে "দত্ত অপহার" পর্য্যন্ত :—রে নিষ্ঠুর বিধি! আমি তো পূর্ব্বে শ্রীকৃষ্ণকে কখনও দেখি নাই, তুই মধ্যে না আসিলে কখনও দেখিতাম কিনা, তাও বলিতে পারি না। তুই তোর পোড়া বিধানের বলে, আমাকে শ্রীকৃষ্ণের অসমোর্দ্ধমাধুর্য্যমণ্ডিত মুখখানা দেখাইলি—দেখাইয়া, সেই অদ্ভুত মাধুর্য্যপূর্ণ মুখখানা আরও দেখিবার নিমিত্ত আমার নয়নের লোভ জন্মাইলি—তাঁহার সঙ্গলাভের নিমিত্ত আমার মনে বলবতী বাসনা জন্মাইলি; এইরূপে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি আমার এবং আমার প্রতিও শ্রীকৃষ্ণের প্রেম জন্মাইলি; প্রেম জন্মাইয়া সেই প্রেমের প্রভাবে আমাদিগকে সম্মিলিত করিলি। আমাদের পরস্পরের সহিত দেখা না করাইলে, আমাদের প্রাণে পরস্পরের প্রতি তুই প্রেম না জন্মাইলে, আমাদের মিলনই অসম্ভব হইত; পরস্পরকে দেখিবার ইচ্ছাও হয়ত আমাদের মনে জাগিত না। প্রেম জন্মাইয়া তুই আমাদিগকে মিলিত করিলি। ভাবিয়াছিলাম, মিলনানন্দেই আমাদের জীবন অতিবাহিত হইবে কিন্তু রে অকরুণ বিধি, পরস্পরের সহিত মিলিত হইয়া আমরা সবে মাত্র পরস্পরের সঙ্গ-সুখ অনুভব করিতে আরম্ভ করিয়াছি,—এমন সময়—যখন পর্য্যন্ত, আমি যথেষ্টরূপে আমার প্রাণ-বল্লভের পরিহাস-বাক্য শ্রবণ করিতে পারি নাই, নির্ভয়ে তদীয় মুখ-কমলের মনোহর কান্তি সন্দর্শন করিতে পারি নাই, আমাকর্ত্তৃক তাঁহার বিশাল বক্ষঃও গাঢ়রূপে আলিঙ্গিত হয় নাই—তখনই—আমাদের আশা না পূরিতেই—তুই তোর নিষ্ঠুর হস্তে আমার প্রাণ-বল্লভকে বলপূর্ব্বক আমার নিকট হইতে কাড়িয়া নিয়া বহুদূরে সরাইয়া দিলি! কেনই বা দিলি! আবার, দিয়া কেনই বা নিলি? দেওয়া জিনিস কাড়িয়া নিলি, বিধি, তোর যে দত্তাপহরণজনিত পাপ হইল রে! দারুণ বিধি! তুই যে কেবল নিষ্ঠুর, তাহাই নহে; তুই মহাপাপীও বটিস্।

৪৬। "অক্রূর করে" হইতে "ঐছে ব্যবহার" পর্য্যন্ত ত্রিপদীর অন্বয় :—শ্রীরাধার ভাবে শ্রীমন্মহাপ্রভু বিধাতাকে বলিলেন, "রে দুরাচার! তুই যদি বলিস্—অক্রূর তোমার (কথিত) দোষ করিয়াছে, তুমি আমায় রোষ করিতেছ কেন?—তবে আমি বলি শুন্—তুই-ই অক্রূরের মূর্ত্তি ধরিয়া শ্রীকৃষ্ণকে চুরি করিয়া নিয়াছিস্, অন্য কাহারও এইরূপ ব্যবহার হইতে পারে না।"

আপনার কর্ম্মদোষ, তোরে কিবা করি রোষ,
তোয় মোয় সম্বন্ধ বিদূর।
যে আমার প্রাণনাথ, একত্র রহি যার সাথ,
সেই কৃষ্ণ হইল নিঠুর ॥ ৪৭

গৌর কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

অক্রূর করে তোমার দোষ—রাধে! আমি (বিধাতা) নির্দ্দয় বলিয়া এবং শ্রীকৃষ্ণকে অপহরণ করিয়াছি বলিয়া তুমি আমাকে যে দোষ দিতেছ, সেই দোষ তো বাস্তবিক আমি করি নাই; অক্রূরই সেই দোষ করিয়াছেন, অক্রূরই নির্দ্দয়ের ন্যায় তোমার নিকট হইতে তোমার প্রাণবল্লভ শ্রীকৃষ্ণকে মথুরায় লইয়া গিয়াছেন, আমি নেই নাই।

আমায় কেনে কর রোষ—রাধে! তুমি আমাকে দোষী মনে করিয়া আমার প্রতি রুষ্ট হইতেছ কেন?

"অক্রূর করে......রোষ"—ইহা বিধাতার উক্তি বলিয়া শ্রীরাধাভাবাবিষ্ট প্রভু মনে করিয়া লইতেছেন।

ইহা—অক্রূর করে ইত্যাদি।

দুরাচার—দুষ্ট আচার যাহার; নির্দ্দয় ও দত্তাপহারী; ইহা বিধাতার প্রতি রাধাভাবাবিষ্ট প্রভুর রোষোক্তি।

তুঞি অক্রূরমূর্ত্তি ধরি—রাধাভাবাবিষ্ট প্রভু বলিলেন,—বিধি! যিনি শ্রীকৃষ্ণকে মথুরায় লইয়া গিয়াছেন, তাঁহার আকৃতি ঠিক অক্রূরের আকৃতির মতনই; কিন্তু তিনি অক্রূর নহেন; অক্রূর নির্দ্দয় হইতে পারেন না; তাঁহার (অক্রূর—অ-নির্দ্দয়—কৃপালু) নামই তাহা সূচিত করিতেছে। তুই-ই অক্রূরের মূর্ত্তি ধারণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে চুরি করিয়া নিয়াছিস্। **অন্যের নহে ঐছে ব্যবহার**—এইরূপ নির্দ্দয় আচরণ অপরের হইতে পারে না, ইহা তোরই আচরণ।

"রে দুরাচার বিধি! তুই হয়তো বলিবি যে, তুই কৃষ্ণকে ব্রজ হইতে মথুরায় লইয়া যাস্ নাই; অক্রূরই লইয়া গিয়াছেন। তোর মতন দুরাচার প্রতারকের পক্ষে, নিজে দোষ করিয়া সেই দোষ অপরের ঘাড়ে চাপাইয়া দেওয়া অসম্ভব—অস্বাভাবিক—নহে। অক্রূর তোর মতন নির্দ্দয় নহেন, অক্রূরের নাম শুনিলেই বুঝা যায়, তিনি ক্রূর (নিষ্ঠুর) নহেন। আর বিধি, তোর নাম শুনিলেই বুঝা যায়, তোর শরীরে মায়া-মমতা নাই—তুই তোর বিধান-অনুসারে কাজ করিবিই, তাতে অপরের প্রাণান্তক কষ্ট হইলেও সেই কষ্ট তোকে তোর বিধান হইতে একটুও বিচলিত করিবে না—কাহারও অবস্থা দেখিয়া তোর চিত্ত বিচলিত হইলে তোর বিধানের মর্য্যাদাই যে তুই রক্ষা করিতে পারিবি না—স্বয়ং বিধান-কর্ত্তা হইয়া তুই কিরূপে তোর বিধান লঙ্ঘন করিবি? তাতেই তোকে মায়া-মমতায় উপেক্ষা করিয়া নির্দ্দয় হইতে হয়। নির্দ্দয়তাশূন্য অক্রূরের কথা তো দূরে, অপর কাহারও পক্ষেও এইরূপ নির্দ্দয়-ব্যবহার সম্ভব নহে; কারণ, অপর কেহই তোর মত বিধাতা নহে। আমাদের নিকট হইতে কৃষ্ণকে অক্রূর লইয়া যায়েন নাই; তবে হাঁ, যিনি লইয়া গিয়াছেন, তাঁর আকৃতিও ঠিক অক্রূরের আকৃতির মতনই এবং তিনি অক্রূর বলিয়া নিজের পরিচয়ও দিয়াছিলেন সত্য; কিন্তু তথাপি তিনি বাস্তবিক অক্রূর নহেন—অক্রূর এমন ক্রূর হইতে পারেন না। প্রেমের নিগূঢ় তত্ত্ব-সম্বন্ধে অজ্ঞতা-বশতঃ আমাদের জন্য তুই যে অদ্ভুত প্রেম-প্রতিকূল বিধান করিয়াছিলি, সেই অদ্ভুত বিধানের মর্য্যাদা রক্ষার উদ্দেশ্যে তুইই অক্রূরের রূপ ধরিয়া আসিয়া আমাদের প্রাণ-কোটিপ্রিয় শ্রীকৃষ্ণকে আমাদের নিকট হইতে চুরি করিয়া লইয়া গিয়াছিস্, নিজের নির্দ্দোষতা-খ্যাপনের নিমিত্তই তুই অক্রূরের রূপ ধরিয়া আসিয়াছিস্।"

৪৭। উপরোক্তভাবে বিধাতাকে ভর্ৎসনা করিয়া রাধাভাবাবিষ্ট প্রভু বোধহয় ক্ষণকাল একটু চিন্তা করিলেন; চিন্তার ফলে তৎক্ষণাৎই আবার বলিলেন—"না বিধি! আমি বোধহয় বৃথাই তোর উপর রুষ্ট হইয়াছি; অনর্থকই তোকে তিরস্কার করিতেছি। তুই হইলি বিধি—জীবের কর্ম্মফল-অনুসারে তাহার সুখ-দুঃখের বিধান করাই তোর কর্ত্তব্য; আমি নিশ্চয়ই ইহজন্মে কি পূর্ব্বজন্মে এমন কোন কর্ম্ম করিয়া থাকিব, যাহার ফলে আমাকে এই বন্ধু-বিরহ-জনিত প্রাণান্তক কষ্টভোগ করিতে হইতেছে; আমার কর্ম্মদোষেই তুই আমার জন্য

সব তেজি ভজি যারে, সেই আপন-হাথে মারে,
নারীবধে কৃষ্ণের নাহি ভয়।
তার লাগি আমি মরি, উলটি না চাহে হরি,
ক্ষণমাত্রে ভাঙ্গিল প্রণয়॥ ৪৮

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

এইরূপ শাস্তির ব্যবস্থা করিয়াছিস, তাতে তোরই বা কি দোষ? তুই তোর কর্ত্তব্যই করিয়াছিস্। আমার দুঃখ দেখিয়া আমার প্রতি করুণা দেখাইবার শক্তিও তোর নাই, তাতে তোর কর্ত্তব্যের অবহেলা হইত, তুই যে বিধি। আর বিধাতা না হইলেও আমার প্রতি করুণা দেখাইবার হেতুও বোধহয় তোর কিছু নাই; কারণ, তোর সঙ্গে আমার কোনও ঘনিষ্ট সম্বন্ধতো নাই; যাদের মধ্যে কোনওরূপ ঘনিষ্ট সম্বন্ধ থাকে, তাদের মধ্যেই একজনের দুঃখে আর একজনের মনে করুণার উদ্রেক হইতে দেখা যায়; কিন্তু তোর সঙ্গে আমার এরূপ কোনও সম্বন্ধতো নাই। তোর সঙ্গে আমার যে সম্পর্ক, তাহা অত্যন্ত দূর সম্বন্ধ—তুই কর্ম্মফলদাতা বিধাতা, আর আমি কর্ম্মফলভোগী জীব; এত দূরবর্ত্তী সম্পর্ক যাদের মধ্যে, তাদের মধ্যে একজনের দুঃখে অপরের মনে করুণার উদয় হওয়া সম্ভব নহে।”

তোয় মোয়—তোতে (বিধাতাতে) আর আমাতে; তোর সঙ্গে আমার সঙ্গে। “তোর আমার” এইরূপ পাঠান্তরও আছে।

সম্বন্ধ—সম্পর্ক।

বিদূর—বিশেষরূপে দূরবর্ত্তী, ঘনিষ্ঠ নহে যাহা। তুই (বিধাতা) কর্ম্মফলদাতা, আর আমি কর্ম্মফলভোক্তা; ইহাই আমার সঙ্গে তোর সম্বন্ধ, ইহা ঘনিষ্ট-সম্বন্ধ নহে। যাদের মধ্যে কোনও ঘনিষ্ট সম্বন্ধ থাকে, সর্ব্বদাই তাদের পরস্পরের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ হয়, ভাবের আদান-প্রদান হয়; তাহার ফলে পরস্পরের প্রতি সহানুভূতি জন্মে; একের সুখে অপরের সুখ, একের দুঃখে অপরের দুঃখ জন্মে। কিন্তু বিধাতার সঙ্গে জীবের এরূপ কোনও সম্বন্ধই নাই। (লীলারস পুষ্টির নিমিত্ত যোগমায়ার প্রভাবে শ্রীরাধিকাদি নিজেদের স্বরূপ ভুলিয়া রহিয়াছেন বলিয়াই নর-লীলার আবেশে নিজেদিগকে জীব বলিয়া মনে করিতেছেন। তাই শ্রীরাধিকা নিজের সম্বন্ধে বলিয়াছেন—“কৃষ্ণকৃপা পারাবার, কভু করিবেন অঙ্গীকার, সখি তোর এ ব্যর্থ বচন। জীবের জীবন চঞ্চল, যেন পদ্মপত্রের জল, ততদিন জীবে কোনজন॥ শত বৎসর পর্য্যন্ত জীবের জীবন অন্ত, এই বাক্য কহনা বিচারি। ২।২।২২-২৩॥”)। **যে আমার প্রাণ-নাথ**—যে শ্রীকৃষ্ণ আমার প্রাণবল্লভ। **একত্র রহি যার সাথ**—যাঁর সঙ্গে সর্ব্বদা একত্র অবস্থান করি। **নিঠুর**—নিষ্ঠুর, নির্দ্দয়।

“শ্রীকৃষ্ণ আমার প্রাণবল্লভ; সর্ব্বদা তাঁহার সঙ্গে আমি একত্র অবস্থান করি; সর্ব্বদা আমরা পরস্পরের ভাবের আদান-প্রদান করি; নর্ম্মালাপে আমরা এমনি ভাবে তন্ময় হইয়া যাই যে, অন্য বিষয়ে কোনও অনুসন্ধানই থাকেনা, কত সময় যে কাটিয়া গেল, তাহাও আমরা বুঝিতে পারি না—আমার মরম তিনি জানেন, তাঁর মরম আমি জানি; কিসে আমার দুঃখ হয়, তাহা তিনি জানেন; কিসে তাঁহার দুঃখ হয়, তাহাও আমি জানি। তিনি কখনও আমাকে দুঃখ দেন নাই—দেওয়ার ইচ্ছাও তাঁর থাকিতে পারে না—এত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ কৃষ্ণের সঙ্গে আমার। কিন্তু সেই কৃষ্ণই যদি এত নিষ্ঠুরতা করিয়া আমাকে ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতে পারেন, তাহা হইলে—বিধি, তুই—তোর সঙ্গে ত আমার এমন কোনও সম্বন্ধ নাই—তুই যে আমার প্রতি নিষ্ঠুর হইবি, ইহা আর আশ্চর্য্যের বিষয় কি?”

এই ত্রিপদী হইতে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ওলাহন আরম্ভ হইয়াছে।

৪৮। “সব তেজি” ইত্যাদি ত্রিপদীতে শ্রীকৃষ্ণের নিষ্ঠুরতা দেখাইতেছেন।

সব তেজি—সমস্ত ত্যাজিয়া; স্বজন-আর্য্যপথাদি সমস্ত ত্যাগ করিয়া। **ভজি যারে**—যাঁহাকে (যে কৃষ্ণকে) ভজি, (সেবা করি)। যাঁহাকে সুখী করার নিমিত্ত সর্ব্বতোভাবে চেষ্টা করি। **আপন-হাথে**—নিজহাতে। **মারে**—প্রাণবধ করে। **নারীবধে** ইত্যাদি—স্ত্রীলোককে বধ করিলে যে পাপ হয়, সেই পাপের ভয় শ্রীকৃষ্ণের

কৃষ্ণে কেনে করি রোষ, আপন দুর্দ্দৈব-দোষ,
পাকিল মোর এই পাপফল।
যে কৃষ্ণ মোর প্রেমাধীন, তারে কৈল উদাসীন,
এই মোর অভাগ্য প্রবল ॥ ৪৯

এইমত গৌররায়, বিষাদে করে 'হায় হায়',
হাহা কৃষ্ণ! তুমি গেলা কতি ?।
গোপীভাব হৃদয়ে, তার বাক্য বিলপয়ে,
গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি ॥ ৫০

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

নাই। **তাঁর লাগি**—তাঁহার (শ্রীকৃষ্ণের) জন্য। তাঁহার বিরহে। **উলটি না চাহে**—ফিরিয়াও চাহে না। **হরি**—শ্রীকৃষ্ণ, যিনি আমার মনপ্রাণ হরণ করিয়া লইয়া গিয়াছেন।

ক্ষণমাত্রে ভাঙ্গিল প্রণয়—অতি অল্প সময়ের মধ্যে প্রণয় ভঙ্গ করিলেন। তাঁর সঙ্গে আমার এত কালের এত প্রণয়; কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, তিনি এত অল্প সময়ের মধ্যেই, চক্ষুর নিমিষেই, ইচ্ছামাত্রেই সেই প্রণয়ের কথা ভুলিয়া গেলেন—যেন তাঁর সঙ্গে আমার কোনও সম্বন্ধই নাই বা কোনও দিন ছিলও না, এমন ভাবেই তিনি চলিয়া গেলেন।

এই পর্য্যন্ত কৃষ্ণের প্রতি ওলাহন বাক্য।

"সব তেজি" হইতে "ভাঙ্গিল প্রণয়" পর্য্যন্ত:—"শ্রীকৃষ্ণকে সুখী করার উদ্দেশ্যে আমি সমস্ত ত্যাগ করিয়াছি—লোকধর্ম্ম, বেদধর্ম্ম, স্বজন-আর্য্যপথ সমস্ত বিসর্জ্জন দিয়াছি। আমি কুলবধূ, রাজার নন্দিনী—কিন্তু সমস্ত ভুলিয়া, দেহ-মন-প্রাণ সমস্তই শ্রীকৃষ্ণে অর্পণ করিয়াছি; নিজের দেহকে মনকে তাঁর ক্রীড়া-পুত্তলি করিয়াছি—তাঁর প্রীতিবিধানের উদ্দেশ্যে। যাহা অপেক্ষা অধিকতর কলঙ্ক কুলবতীদিগের আর হইতে পারে না, অম্লানবদনে আমি তাহাই মাথায় লইয়াছি, ঘর ছাড়িয়া বনে আসিয়াছি—কেবলমাত্র তাঁকে সুখী করার নিমিত্ত। কিন্তু হায়! তিনি কি করিলেন? তিনি এখন নিজ হাতেই আমাকে বধ করিলেন! তিনি জানেন—তিনিই আমার জীবাতু; তিনি জানেন—তাঁহার বিরহে আমার প্রাণধারণ অসম্ভব। কিন্তু এসব জানিয়াও তিনি আমাকে ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন—দেখিতেছি, নারীবধেও তাঁহার ভয় নাই। তাঁর জন্য আমি প্রাণে মরিতেছি—"হা প্রাণবল্লভ" বলিয়া চীৎকার করিয়া প্রাণ ফাটাইতেছি—তিনি একবার ফিরিয়াও চাহিলেন না! হায় হায়! যে প্রণয়ে তিনি আমাকে আবদ্ধ করিয়াছিলেন, নয়নের পলকেই তিনি সেই প্রণয়-বন্ধন ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন! তিনি আমার প্রাণ-মন চুরি করিয়া চলিয়া গেলেন!"

৪৯। আবার ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া রাধাভাবাবিষ্ট প্রভু বলিলেন—"না না; কৃষ্ণের প্রতি কেন বৃথা রুষ্ট হইতেছি; তাঁর কোনও দোষ নাই—দোষ আমার অদৃষ্টের; হয়তো আমি কোনও গুরুতর পাপ করিয়াছি, সেই পাপের ফল এখন আমাকে ভোগ করিতে হইতেছে। কৃষ্ণের কোনও দোষ নাই—তিনি তো আমার প্রেমের অধীনই ছিলেন—ইহা রাস-রজনীতে তিনি নিজ মুখেই স্বীকার করিয়াছেন; তিনি নিজে ইচ্ছা করিয়া আমাকে ত্যাগ করিতে পারেন না; আমার প্রবল দুর্ভাগ্যই আমার প্রতি তাঁহাকে উদাসীন করিয়াছে, আমার সর্ব্বনাশ সাধন করিয়াছে। আমার প্রতি আমার প্রাণবল্লভের যে প্রগাঢ় প্রেম ছিল, অল্প দুর্ভাগ্য তাহা হইতে আমাকে বঞ্চিত করিতে সমর্থ নহে—তাঁহার অনুরাগ অপেক্ষাও আমার বলবত্তর দুর্ভাগ্য, আমা হইতে তাঁহাকে বিচ্ছিন্ন করিয়াছে।" (পূর্ব্ববর্ত্তী ৪৭ ত্রিপদীর টীকায় "বিদূর" শব্দের ব্যাখ্যার শেষভাগে বন্ধনীর অন্তর্গত অংশ দ্রষ্টব্য)।

৫০। **এই মত**—পূর্ব্বোক্তরূপে। **বিষাদে**—৩।১৭।৪৬ ত্রিপদীর টীকা দ্রষ্টব্য। **কতি**—কোথায়। বিষাদে প্রভু "হায় হায়" করিতে লাগিলেন, আর কেবল বলিতে লাগিলেন—"হা হা কৃষ্ণ! তুমি কোথায় গেলে?" **গোপীভাব হৃদয়ে**—প্রভুর চিত্তে গোপীভাবের আবেশ। **তার বাক্য বিলপয়ে**—বিলাপ করিয়া প্রভু তার (গোপীর) বাক্যই (কথাই) বলিতে লাগিলেন।

গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি—অক্রূরের রথে চড়িয়া শ্রীকৃষ্ণ যখন মথুরায় যাইতেছিলেন, তখন তাঁহার বিরহ-বিধুরা গোপীগণ "গোবিন্দ-দামোদর মাধব" ইত্যাদি বলিয়া বিলাপ করিয়াছিলেন। গোপী-ভাবাবিষ্ট প্রভুও

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

তাঁহাদের উচ্চারিত "গোবিন্দ-দামোদর-মাধবেতি" বাক্য উচ্চারণ করিয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন। 'গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি," শ্রীমদ্ভাগবতের শ্রীশুকোক্ত একটী শ্লোকের অংশ :—"এবং ব্রুবাণা বিরহাতুরা ভৃশং ব্রজস্ত্রিয়ঃ কৃষ্ণবিষক্তমানসাঃ। বিসৃজ্য লজ্জাং রুরুদুঃ স্ম সুস্বরং গোবিন্দ-দামোদর-মাধবেতি॥ ১০।৩৯।৩১॥" অক্রুরের রথে শ্রীকৃষ্ণ মথুরায় যাইতেছেন দেখিয়া, নিজেদের বিরহ-দুঃখের হেতুভূতরূপে প্রথমে বিধাতাকে, তারপর শ্রীকৃষ্ণকে, তারপর নিজেদের অদৃষ্টকে দোষ দিতে দিতে ব্রজগোপীগণ যখন মিলিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণকে প্রতিনিবৃত্ত করিবার নিমিত্ত গমনোন্মুখা হইলেন, তখন স্তম্ভাদি-বশতঃ গমনে অসমর্থ হইয়া কেবলমাত্র রোদন করিতেই লাগিলেন; ইহাই উল্লেখ করিয়া শ্রীশুকদেব বলিতেছেন—"এইরূপ বলিতে বলিতে বিরহে অত্যন্ত বিবশহৃদয় ও স্বাভাবিক-প্রেমরস-ময়ত্বে প্রসিদ্ধ গোপীগণ, প্রেমবশতঃ শ্রীকৃষ্ণে অত্যন্ত আসক্তচিত্তা হইয়া লজ্জা বিসর্জ্জন পূর্ব্বক উচ্চৈঃস্বরে 'হে গোবিন্দ! হে দামোদর! হে মাধব" এইরূপ বলিয়া রোদন করিতে লাগিলেন।'

গোপী-ভাবাবিষ্ট প্রভুর মুখে **গোবিন্দ**-শব্দের ধ্বনি বোধহয় এইরূপ :—"তুমি গোকুলের ইন্দ্র; তোমার অভাবে এই গোকুল ক্ষণ-কালমধ্যেই বিনষ্ট হইবে; অতএব হে গোবিন্দ! তুমি মথুরায় যাইও না।" অথবা গো (গাভী)-সমূহকে পালন করেন যিনি, তিনি গোবিন্দ। "হে গোবিন্দ! ব্রজের এই লক্ষ লক্ষ ধেনু তোমারই মুখ চাহিয়া জীবিত থাকে; তোমাকে না দেখিলে তাহারা নিজেদের বৎস-সমূহকেও দুগ্ধ দান করে না, একগ্রাস তৃণ পর্য্যন্তও মুখে দেয় না; তাহা তুমি জান; তুমি চলিয়া গেলে তোমা-গত-প্রাণ ধেনু-কুলের কি অবস্থা হইবে, একবার ভাবিয়া দেখ। এই ধেনুদিগের কথা ভাবিয়া তুমি প্রতিনিবৃত্ত হও—মথুরায় যাইও না।" অথবা, গো (ইন্দ্রিয়)-সমূহকে পালন (তৃপ্তিদান) করেন যিনি, তিনি গোবিন্দ। "হে গোবিন্দ! তুমি তোমার অসমোর্দ্ধ-মাধুর্য্যমণ্ডিত রূপ-লাবণ্য দেখাইয়া আমাদের নয়নকে, তোমার সুমধুর নর্ম্ম-পরিহাসাদি শ্রবণ করাইয়া আমাদের কর্ণকে, মৃগমদ-নীলোৎপল-বিনিন্দিত তোমার সুমধুর অঙ্গ-গন্ধ দ্বারা আমাদের নাসিকাকে, তোমার অধরামৃত দ্বারা আমাদের জিহ্বাকে, তোমার কোটীচন্দ্র-সুশীতল অঙ্গ-স্পর্শ দ্বারা আমাদের ত্বগিন্দ্রিয়কে এবং তোমার সঙ্গ-সুখ দ্বারা আমাদের মনকে—এইরূপে তুমি আমাদের সমস্ত ইন্দ্রিয়কেই তাহাদের বাঞ্ছিত বস্তু দ্বারা তৃপ্তিদান করিয়া পালন করিয়াছ; তোমার বিরহে এই সকল ইন্দ্রিয় (অর্থাৎ) এই সকল ইন্দ্রিয়ের অধিকারীণী গোপীগণ কিরূপে জীবন ধারণ করিবে? তাহাদের প্রতি কৃপা করিয়া তুমি প্রতিনিবৃত্ত হও।" অথবা, ইন্দ্রিয়গণকে গ্রহণ করেন যিনি, তিনি গোবিন্দ। "হে গোবিন্দ! তুমি তো চলিলে, আমাদের মন-চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গণকেও সঙ্গে করিয়া লইয়া যাও; নচেৎ তাহারা (তাহাদের অধিকারিণীগণ) জীবিত থাকিবে না।"

দামোদর-শব্দের তাৎপর্য্য। ব্রজেশ্বরী রজ্জু (দাম) দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের উদর-দেশে বন্ধন করিয়াছিলেন (দামবন্ধন-লীলা)। তজ্জন্য শ্রীকৃষ্ণের একটী নাম হইয়াছে "দামোদর"। এই দামোদর-শব্দ উচ্চারণ করিয়া গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণকে ব্রজেশ্বরীর স্নেহের কথাই স্মরণ করাইয়া দিতেছেন। "হে দামোদর! যে ব্রজেশ্বরী তোমাকে রজ্জু দ্বারা বন্ধন করিয়া পরে অনুতাপানলে দগ্ধ হইয়াছিলেন, তাঁহার স্নেহের কথা একবার স্মরণ কর; অথবা, যাঁহার স্নেহরজ্জুতে তুমি বদ্ধ হইয়াছিলে, তাঁহার কথা একবার স্মরণ কর। তোমার বিরহে তিনি প্রাণে বাঁচিবেন না।"

মাধব-শব্দের-তাৎপর্য্য। মা-অর্থ লক্ষ্মী; ধব-অর্থ পতি। মা-ধব—লক্ষ্মীপতি, লক্ষ্মীও যাঁহাকে পতিত্বে বরণ করিয়াছেন। হে মাধব! তোমার সৌন্দর্য্যে মাধুর্য্যে, তোমার বিলাস-বৈদগ্ধীতে মুগ্ধা হইয়া নারায়ণের বক্ষোবিলাসিনী লক্ষ্মীও নাকি তোমাকে পতিরূপে পাইবার জন্য উদ্বিগ্না হইয়াছিলেন; এবং তিনিই নাকি একটী স্বর্ণরেখারূপে তোমার বক্ষোদেশে বিরাজিত আছেন। বৈকুণ্ঠের অধিষ্ঠাত্রী দেবী হইয়াও, নারায়ণের বক্ষোবিলাসিনী হইয়াও লক্ষ্মী যাঁহার বৈদগ্ধ্যাদি গুণের আকর্ষণ উপেক্ষা করিতে পারেন নাই—সামান্য গ্রাম্য-গোয়ালিনী আমরা কিরূপে তাহা উপেক্ষা করিব? লক্ষ্মী দেবী, তাঁর শক্তি অতুলনীয়া; তিনিও তোমার বিচ্ছেদ-দুঃখ সহ্য করিতে

তবে স্বরূপ রামরায়, করি নানা উপায়,
মহাপ্রভুর করে আশ্বাসন।
গায়েন সঙ্গমগীত, প্রভুর ফিরাইল চিত,
প্রভুর কিছু স্থির হৈল মন ॥ ৫১
এইমত বিলপিতে অর্দ্ধ রাত্রি গেল।
গম্ভীরাতে স্বরূপগোসাঞি প্রভুকে শোয়াইল ॥৫২
প্রভুকে শোয়াঞা রামানন্দ গেলা ঘরে।
স্বরূপ গোবিন্দ শুইল গম্ভীরার দ্বারে ॥ ৫৩
প্রেমাবেশে মহাপ্রভুর গরগর মন।
নামসঙ্কীর্ত্তন করে বসি করে জাগরণ ॥ ৫৪
বিরহে ব্যাকুল প্রভুর উদ্বেগ উঠিলা।
গম্ভীরার ভিত্ত্যে মুখ ঘষিতে লাগিলা ॥ ৫৫
মুখে গণ্ডে নাকে ক্ষত হইল অপার।
ভাবাবেশে না জানে প্রভু পড়ে রক্তধার ॥ ৫৬

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

পারেন না; তাই রেখারূপে নিরন্তর তোমার সঙ্গ করিতেছেন। আমরা মানবী হইয়া কিরূপে তোমার বিরহ-যন্ত্রণা সহ্য করিব? আমরা মানবী, আমাদের এমন কোনও শক্তি নাই, যদ্দ্বারা রেখাদিরূপে নিজেদিগকে রূপান্তরিত করিয়া তোমার সঙ্গে থাকিতে পারি। এই অবস্থায়, তোমার বিরহে আমাদিগকে নিশ্চয়ই প্রাণত্যাগ করিতে হইবে; আমাদের দূরবস্থার কথা বিবেচনা করিয়া তুমি প্রতি-নিবৃত্ত হও। অথবা, মা-অর্থ না; ধব—পতি। মাধব-পতি নহ; হে মাধব! তুমি আমাদের পতি বা স্বামী নহ; যদি স্বামী হইতে, তাহা হইলে আমাদের উপর তোমার স্বত্ব-স্বামিত্ব থাকিত, আমরা তখন তোমার নিজবস্তু হইতাম; সুতরাং তখন তুমি আমাদিগকে বধ করিলেও তোমার বিশেষ কিছু দোষ হইত না; তোমার বস্তু, তুমি যাহা ইচ্ছা করিতে পারিতে। কিন্তু তুমি আমাদের পতি নহ-তুমি আমাদের সখা, তোমার সম্বন্ধে আমরা পরবস্তু, পরের বস্তু বিনষ্ট করায় তোমার কোনও অধিকার নাই—ইহা ভাবিয়া তুমি প্রতিনিবৃত্ত হও।

৫১। করে আশ্বাসন—প্রভুকে আশ্বস্ত করেন।

সঙ্গম-গীত—শ্রীকৃষ্ণের সহিত শ্রীরাধার মিলন-বিষয়ক গীত। এইরূপ গীত শুনিতে শুনিতে রাধাভাবাবিষ্ট প্রভু ক্রমশঃ মনে করিতে পারিলেন যে, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার সহিত মিলিত হইয়াছেন। এইরূপ মনে হইলেই তাঁহার বিরহ-যন্ত্রণা দূরীভূত হইত, চিত্ত স্থির হইত।

৫৩। প্রভুকে শয়ন করাইয়া রায়-রামানন্দ নিজগৃহে গেলে পরে স্বরূপ-দামোদর ও গোবিন্দ গম্ভীরার দরজার সম্মুখে শয়ন করিয়া রহিলেন।

৫৪। রাধা-প্রেমের আবেশে প্রভুর চিত্ত উদ্বেলিত; তিনি গম্ভীরার মধ্যে বসিয়া বসিয়া নামসঙ্কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন এবং এই ভাবেই জাগরণ করিতে লাগিলেন, ঘুমাইলেন না।

৫৫। বিরহে ব্যাকুল—শ্রীকৃষ্ণবিরহে প্রভুর চিত্ত অত্যন্ত ব্যাকুল (অস্থির)। **উদ্বেগ**—মনের অস্থিরতা। ৩।১৭।৪৬ ত্রিপদীর টীকা দ্রষ্টব্য। উদ্বেগভাবের উদয়ে প্রভু অস্থির হইয়া পড়িলেন এবং উপবেশন হইতে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। "প্রভুর উদ্বেগ উঠিলা" স্থলে "প্রভু উদ্বেগে উঠিলা" পাঠান্তরও আছে।

ভিত্তি—প্রাচীর; দেওয়াল। **গম্ভীরার ভিত্ত্যে**—গম্ভীরানামক প্রকোষ্ঠের ভিত্তিতে। "ভিত্ত্যে" স্থলে কোনও কোনও গ্রন্থে "ভিতরে" পাঠ আছে। কিন্তু দাস-গোস্বামীর শ্রীগৌরাঙ্গস্তব-কল্পতরু গ্রন্থেও "ভিত্তি' পাঠ দেখা যায়। **ঘষিতে লাগিলা**—ঘর্ষণ করিতে (ঘষিতে) আরম্ভ করিলেন। প্রভু উঠিয়া গম্ভীরার প্রাচীরে বা দেওয়ালে নিজের মুখ ঘষিতে লাগিলেন। কেন প্রভু মুখ ঘষিতেছিলেন, তাহা পরবর্ত্তী "দ্বার চাহি বুলি" ইত্যাদি বাক্যেই ব্যক্ত করা হইয়াছে।

৫৬। গণ্ডে—গালে। **রক্তধার**—রক্তের ধারা। ভিত্তিতে মুখ-ঘর্ষণের ফলে প্রভুর মুখে, গালে ও নাকের অনেক স্থানে খুব বেশী রকম ক্ষত হইয়া গেল। ঐ সকল ক্ষতস্থান হইতে রক্তের ধারা পড়িতে লাগিল; কিন্তু ভাবাবেশে প্রভুর বাহ্যস্মৃতি ছিল না বলিয়া তিনি ঐ ক্ষত বা রক্তধারা সম্বন্ধে কিছুই জানিতে পারিলেন না।

সর্ব্বরাত্রি করে ভাবে মুখ সঙ্ঘর্ষণ।
গোঁ গোঁ শব্দ করে স্বরূপ শুনিল তখন॥ ৫৭
দীপ জ্বালি ঘরে গেল, দেখি প্রভুর মুখ।
স্বরূপ গোবিন্দ দোঁহার হৈল মহাদুঃখ॥ ৫৮
প্রভুকে শয্যাতে আনি সুস্থির করিল।
'কাহা কৈলে এই তুমি?' স্বরূপ পুছিল?॥ ৫৯
প্রভু কহে—উদ্বেগে ঘরে না পারি রহিতে।
দ্বার চাহি বুলি শীঘ্র বাহির হইতে॥ ৬০
দ্বার নাহি পাই, মুখ লাগে চারিভিতে।
ক্ষত হয় রক্ত পড়ে না পারি যাইতে॥ ৬১
উন্মাদ-দশায় প্রভুর স্থির নহে মন।
যে করে যে বোলে সব উন্মাদ-লক্ষণ॥ ৬২
স্বরূপ গোসাঞি তবে চিন্তা পাইল মনে।
ভক্তগণ লঞা বিচার কৈল আরদিনে॥ ৬৩

গৌর-কৃপা তরঙ্গিণী টীকা।

৫৭। এইরূপে সমস্ত রাত্রিই প্রভু ক্রমাগত মুখ-ঘর্ষণ করিতে লাগিলেন, শেষকালে উদ্বেগে গোঁ গোঁ শব্দ করিতেও লাগিলেন। কতক্ষণ পরে, প্রভুর গোঁ গোঁ শব্দ স্বরূপ-দামোদর শুনিতে পাইলেন।

৫৮। **দীপ জ্বালি**—প্রদীপ জ্বলিয়া।

গোঁ গোঁ-শব্দ শুনিয়া স্বরূপ ও গোবিন্দ প্রদীপ জ্বালাইয়া প্রদীপ হাতে গম্ভীরার মধ্যে গেলেন; প্রদীপের আলোকে প্রভুর মুখে ক্ষত ও রক্তধারা দেখিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন।

৫৯। তখন তাঁহারা প্রভুকে ধরিয়া প্রভুর বিছানায় আনিয়া তাঁহাকে সুস্থির করিলেন; তারপর প্রভু স্থির হইলে, স্বরূপ জিজ্ঞাসা করিলেন "প্রভু, তুমি কি করিয়াছ? কিরূপে তোমার মুখে ক্ষত হইল?"

৬০-৬১। প্রভু কহে ইত্যাদি দুই পয়ারঃ—স্বরূপের প্রশ্নের উত্তরে প্রভু বলিলেন (প্রভুর এখন কিঞ্চিৎ বাহ্যজ্ঞান হইয়াছিল)—"স্বরূপ! শ্রীকৃষ্ণবিরহে আমি অস্থির হইয়া পড়িয়াছিলাম, উদ্বেগে আর ঘরে থাকিতে পারিতেছিলাম না। মনে করিয়াছিলাম, বাহিরে যাইয়া কৃষ্ণকে অন্বেষণ করিব, তাড়াতাড়ি বাহির হইতে চেষ্টা করিলাম; বাহির হওয়ার দ্বার ঠিক করিতে না পারিয়া চারিদিকে দ্বার অন্বেষণ করিয়া ঘুরিতে লাগিলাম; কিন্তু দ্বার পাইলাম না, বাহিরেও যাইতে পারিলাম না, লাভের মধ্যে চারিদিকের দেওয়ালের সঙ্গে মুখের ঘষা লাগিয়া মুখে ক্ষত হইয়াছে ও ক্ষত হইতে রক্ত পড়িতেছে।"

কৃষ্ণ-বিরহকাতরা শ্রীরাধার ভাবে প্রভু বোধহয় মনে করিয়াছিলেন যে, শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলনের অভিপ্রায়ে অভিসার করিয়া আসিয়া কৃষ্ণের অপেক্ষায় তিনি একাই নিকুঞ্জে বসিয়া আছেন; কৃষ্ণ আসিতেছেন না বলিয়া অত্যন্ত উদ্বিগ্না হইয়া মনে করিলেন, কুঞ্জের বাহিরে যাইয়া অন্বেষণ করিলেই কৃষ্ণকে পাইবেন; তাই বাহিরে যাওয়ার চেষ্টা করিয়াছিলেন। এস্থলে গম্ভীরাকে নিকুঞ্জমন্দির মনে করা এবং কৃষ্ণকে বৃন্দাবনস্থিত মনে করিয়া তাঁহার অন্বেষণের নিমিত্ত বাহিরে যাওয়ার চেষ্টা (প্রেম-বৈবশ্য-চেষ্টিত)—উদ্ঘূর্ণার লক্ষণ বলিয়াই মনে হয়।

৬২। **উন্মাদ-দশায়**—রাধাভাবে দিব্যোন্মাদের অবস্থায়। **উন্মাদ-দশায়-প্রভুর** ইত্যাদি—প্রভু প্রায় সর্ব্বদাই দিব্যোন্মাদের অবস্থায় থাকেন বলিয়া তাঁহার মন কখনও স্থির থাকেনা; তাঁহার বাহ্যস্মৃতি থাকে না বলিয়া দেহানুসন্ধানাদিও থাকে না। **যে করে**—প্রভু যাহা যাহা করেন। **যে বোলে**—প্রভু যাহা যাহা বলেন। **সব উন্মাদ-লক্ষণ**—প্রভু যাহা যাহা করেন এবং যাহা যাহা বলেন, তৎসমস্তেই দিব্যোন্মাদের লক্ষণ প্রকাশ পায়। যাহা করেন, তাহা প্রেম-বৈবশ্যজনিত উদ্ঘূর্ণা এবং যাহা বলেন, তাহা চিত্রজল্পাদি।

৬৩। স্বরূপ-গোসাঞি ভাবিলেন—প্রভুর তো বাহ্যজ্ঞানই থাকেনা, তাই দেহস্মৃতিও থাকেনা। এক দিন তো গম্ভীরার দেওয়ালে মুখ ঘসিয়া নাকে মুখে ক্ষত করিয়া ফেলিলেন; আবার কোন্ দিন কি করিয়া বসেন, তাহারই বা ঠিক কি? এই সমস্ত ভাবিয়া, প্রভুর দিব্যোন্মাদ-অবস্থার আচরণে প্রভুর শ্রীঅঙ্গের কষ্টের আশঙ্কা করিয়া স্বরূপ

সব ভক্তগণ মিলি প্রভুরে সাধিল।
শঙ্কর পণ্ডিত প্রভুর সঙ্গে শোয়াইল ॥ ৬৪
প্রভুর পাদতলে শঙ্কর করেন শয়ন।
প্রভু তার উপরে করে পাদপ্রসারণ ॥ ৬৫
'প্রভুপাদোপধান' বলি তার নাম হৈল।
পূর্ব্বে বিদুরে যেন শ্রীশুক বর্ণিল ॥ ৬৬

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

অত্যন্ত চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। এক দিন তিনি সকল ভক্তকে একত্র করিয়া, প্রভুর দেহের রক্ষার নিমিত্ত কি কি উপায় অবলম্বন করা যাইতে পারে, তাহা নির্দ্ধারণের নিমিত্ত পরামর্শ করিলেন।

৬৪। পরামর্শ করিয়া সকলে স্থির করিলেন যে, প্রভুর সঙ্গে সর্ব্বদা একজন প্রহরী থাকার দরকার; তিনি যেন সর্ব্বদা প্রভুর আচরণের প্রতি লক্ষ্য রাখেন এবং প্রভুর দেহের কষ্ট হইতে পারে, এমন সব আচরণের যেন বাধা দেন। সকলে স্থির করিলেন—রাত্রিতে প্রভু যখন শয়ন করিবেন, তখন শঙ্কর-পণ্ডিতও প্রভুর সঙ্গে গম্ভীরার মধ্যে শয়ন করিবেন; কিন্তু প্রভু এই প্রস্তাবে সম্মত হইবেন কিনা, তাহাও সন্দেহ; তাই সকলে মিলিয়া অনেক অনুনয়-বিনয় করিয়া প্রভুকে এই প্রস্তাবে সম্মত করাইলেন। তদবধি শঙ্কর-পণ্ডিত প্রভুর সঙ্গে গম্ভীরায় শয়ন করিতে লাগিলেন।

শঙ্কর পণ্ডিতের প্রতি প্রভুর গৌরব-বুদ্ধিহীন শুদ্ধা কেবলাপ্রীতি; একথা প্রভু নিজ মুখেই প্রকাশ করিয়াছেন (২।১৯।৩২-৩৩)। এজন্যই বোধহয় স্বরূপ-দামোদরাদি প্রভুর সঙ্গে শুইবার জন্য অন্য কাহাকেও নির্ব্বাচিত না করিয়া শঙ্কর-পণ্ডিতকেই নির্ব্বাচিত করিলেন; তাঁহারা মনে করিয়াছিলেন—ইঁহাকে সঙ্গে রাখিতে প্রভুর মনে কোনও রূপ সঙ্কোচ হইবে না। গৌরগণোদ্দেশ-দীপিকা বলেন—"যস্যা বক্ষসি সুষ্বাপ কৃষ্ণো বৃন্দাবনে পুরা। সা শ্রীভদ্রাদ্য গৌরাঙ্গপ্রিয়-শঙ্করপণ্ডিতঃ ॥ ১৫৭ ॥—ব্রজলীলায় যিনি শ্রীভদ্রা নাম্নী সখী ছিলেন এবং যাঁহার বক্ষে শ্রীকৃষ্ণ সুখে নিদ্রা যাইতেন, তিনিই এক্ষণে শঙ্কর-পণ্ডিত।" ইহাতে বুঝা যাইতেছে, পূর্ব্বলীলাতেও শঙ্কর-পণ্ডিত সম্বন্ধে প্রভুর কোনও সঙ্কোচ ছিলনা; সুতরাং এই লীলাতেও সঙ্কোচ থাকার হেতু নাই। দুই লীলাতে পরিকরদের দেহভেদ থাকিলেও ভাবের ভেদ নাই, যেহেতু, তাঁহাদের ভাব নিত্যসিদ্ধ।

প্রভুরে সাধিল—শঙ্কর-পণ্ডিতকে রাত্রিতে গম্ভীরায় স্থান দেওয়ার নিমিত্ত অনুনয়-বিনয় করিয়া প্রভুকে সম্মত করাইলেন।

৬৫। সেই দিন হইতে প্রভু যখন গম্ভীরায় শয়ন করেন, তখন শঙ্কর-পণ্ডিতও প্রভুর চরণতলে আড়ভাবে শুইয়া থাকেন; প্রভু তাঁহার দেহের উপরে চরণ রাখিয়া শুইতেন—যেমন বালিশের উপরে লোকে পা রাখিয়া ঘুমায়।

৬৬। **পাদোপধান**—পাদ+উপধান (বালিশ); পা রাখিবার বালিশ; পা-বালিশ। **প্রভু-পাদোপধান**—প্রভুর পা-বালিশ। যখন হইতে শঙ্কর-পণ্ডিত প্রভুর চরণতলে শয়ন করিতে লাগিলেন এবং প্রভুও তাঁহার দেহের উপর চরণ রাখিয়া ঘুমাইতে আরম্ভ করিলেন, তখন হইতেই শঙ্কর-পণ্ডিতকে সকলে প্রভুর পাদোপধান (পা বালিশ) বলিতেন। **তার নাম**—শঙ্কর-পণ্ডিতের নাম। **পূর্ব্বে**—দ্বাপরলীলা-বর্ণন-সময়ে শ্রীমদ্‌ভাগবতে।

শ্রীশুকদেব গোস্বামী শ্রীমদ্‌ভাগবতে বিদুরকেও শ্রীকৃষ্ণের পাদোপধান (পা-বালিশ) বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। তদ্রূপ এক্ষণেও প্রভুর পার্ষদ ভক্তগণ শঙ্কর-পণ্ডিতকে মহাপ্রভুর পাদোপধান বলিয়া ডাকিতে লগিলেন।

বিদুরকে যে কৃষ্ণের পাদোপধান বলা হইয়াছিল, তাহার প্রমাণ পশ্চাদুক্ত "ইতি ব্রুবাণং" ইত্যাদি শ্লোক।

"বিদুরে" স্থলে "উদ্ধবে" পাঠান্তরও আছে; কিন্তু ইহা সঙ্গত বলিয়া মনে হয় না; কারণ, প্রমাণরূপে উদ্ধৃত শ্লোকে বিদুরের নামই দেখিতে পাওয়া যায়, উদ্ধবের নাম তাহাতে নাই।

তথাহি (ভাঃ ৩।১৩।৫)—

ইতি ব্রুবাণং বিদুরং বিনীতং
সহস্রশীর্ষশ্চরণোপধানম্।
প্রহৃষ্টরোমা ভগবৎকথায়াং
প্রণীয়মানো মুনিরভ্যচষ্ট ॥ ৪ ॥

শঙ্কর করেন প্রভুর পাদসংবাহন।
ঘুমাঞা পড়েন তৈছে করেন শয়ন ॥ ৬৭

উঘাড়-অঙ্গে পড়িয়া শঙ্কর নিদ্রা যায়।
প্রভু উঠি আপন কান্থা তাহারে ওড়ায় ॥ ৬৮

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

সহস্র-শীর্ষা শ্রীকৃষ্ণ স্তস্য চরণাবুপধীয়েতে যস্মিন্ শ্রীকৃষ্ণঃ প্রীত্যা যস্যোৎসঙ্গে চরণৌ প্রসারয়তীত্যর্থঃ। তমভ্যচষ্ট অভ্যভাষত প্রণীয়মানঃ তেন প্রবর্ত্ত্যমানঃ। স্বামী। ৪

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

শ্লো। ৪। **অন্বয়**। ভগবৎ-কথায়াং (ভগবৎ-কথায়) প্রণীয়মানঃ (প্রবর্ত্ত্যমান) প্রহৃষ্টরোমা (পুলকিতগাত্র) মুনিঃ (মৈত্রেয়-মুনি) ইতি ব্রুবাণং (এই কথা যিনি বলিয়াছিলেন, সেই) বিনীতং (বিনীত) সহস্রশীর্ষশ্চরণোপধানং (শ্রীকৃষ্ণের পাদোপধানস্বরূপ) বিদুরং (বিদুরকে) অভ্যচষ্ট (বলিলেন)।

অনুবাদ। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের পাদোপধান-স্বরূপ বিদুর বিনীত ভাবে এই প্রশ্ন করিলে, ভগবৎ-কথায় প্রবর্ত্ত্যমান মৈত্রেয়-মুনি পুলকিত-গাত্র হইয়া বলিতে লাগিলেন। ৪

মহামুনি মৈত্রেয় যখন হরিদ্বারে ছিলেন, তখন মহাত্মা বিদুর তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইয়া বিনীতভাবে ভগবত্তত্ত্বাদিসম্বন্ধে কতকগুলি প্রশ্ন করিলেন; বিদুরের প্রশ্নে পরমপ্রীত হইয়া মৈত্রেয় মুনি ভগবৎ-কথা-কথনে প্রবৃত্ত হইলেন। প্রসঙ্গক্রমে স্বায়ম্ভুব মনুর কথা উঠিয়া পড়িল; এই স্বায়ম্ভুব-মনুসম্বন্ধেও বিদুর জিজ্ঞাসু হইলে মৈত্রেয় যাহা বলিয়াছিলেন, তাহারই সূচনা করা হইয়াছে এই শ্লোকে।

মৈত্রেয়মুনি বিদুরকে তাঁহার প্রশ্নের উত্তর **অভ্যচষ্ট**—বলিলেন (মৈত্রেয় যাহা বলিলেন, শ্রীমদ্ভাগবতের ৩।১৩।৫-আদি শ্লোকে তাহা বিবৃত হইয়াছে)। মৈত্রেয় কিরূপ ছিলেন তাহা বলিতেছেন—মৈত্রেয় ভগবৎ-কথায় **প্রণীয়মানঃ**—প্রবর্ত্ত্যমান ছিলেন; হরিদ্বারে যাইয়া বিদুর ভগবৎ-সম্বন্ধীয় প্রশ্ন করাতেই মৈত্রেয় তৎসম্বন্ধীয় আলোচনায় প্রবৃত্ত হন; সুতরাং বিদুরকর্ত্তৃকই তিনি ভগবৎ-কথায় প্রবর্ত্তিত হইয়াছিলেন; তাই বলা হইয়াছে বিদুরকর্ত্তৃক প্রণীয়মানঃ (প্রবর্ত্ত্যমান) মৈত্রেয় ভগবৎ-কথা বলিতে বলিতেই সাত্ত্বিক ভাবের উদয়ে **প্রহৃষ্টরোমাঃ**—পুলকিত-গাত্র হইলেন, তাঁহার দেহে রোমাঞ্চের উদয় হইল; এই অবস্থায় তিনি বিদুরের প্রশ্নের উত্তর দিলেন। বিদুর কিরূপ ছিলেন? **ইতি ব্রুবাণং**—এই কথা—স্বায়ম্ভুব মুনিসম্বন্ধে প্রশ্ন-জিজ্ঞাসু এবং **সহস্রশীর্ষশ্চরণোপধানম্**—শ্রীকৃষ্ণের চরণোপধান সদৃশ বিদুর। শ্রীকৃষ্ণ যখন বিদুরের গৃহে উপস্থিত হইয়াছিলেন, তখন বিদুরের শঙ্কানিবৃত্তির নিমিত্ত তিনি সহস্র-শীর্ষ-বিগ্রহ প্রকটিত করিয়াছিলেন। "সহস্রশীর্ষা বিদুরশঙ্কানিবৃত্ত্যর্থং তদ্গৃহে ধৃতসহস্র-শীর্ষবিগ্রহঃ শ্রীকৃষ্ণস্তস্য চরণয়োরুপধানমুপবর্হরূপং মহাভারতে বিদুরগৃহে ভোজনে ভগবাংস্তদুৎসঙ্গে চরণৌ নিধায় সুষ্বাপেতি প্রসিদ্ধেঃ। চক্রবর্ত্তিটীকা।" তাই এস্থলে বিদুরের প্রসঙ্গে সহস্রশীর্ষা বলিতে শ্রীকৃষ্ণকেই বুঝাইতেছে। বিদুর ছিলেন এই সহস্রশীর্ষা শ্রীকৃষ্ণের চরণদ্বয়ের উপধান (বালিশ); বিদুরের গৃহে ভোজনের পরে শ্রীকৃষ্ণ বিদুরের ক্রোড়েই চরণযুগল রাখিয়া ঘুমাইয়াছিলেন; তাই বিদুরকে শ্রীকৃষ্ণের চরণোপধান (পা-বালিশ) বলা হয়।

৬৬ পয়ারোক্তির প্রমাণ এই শ্লোক।

৬৭। ঘুমাঞা পড়েন—প্রভু যখন ঘুমাইয়া পড়েন, তখন। **তৈছে**—ঐরূপে; পা-বালিশরূপে। **করেন শয়ন**—শঙ্কর শয়ন করেন।

৬৮। উঘাড়-অঙ্গে—অনাবৃত দেহে; খালি গায়ে। **আপন কান্থা**—প্রভুর নিজের গায়ের কাঁথা। **তাহারে ওড়ায়**—ওড়নির (চাদরের) মত তাহার (শঙ্করের) গায়ে দেন।

নিরন্তর ঘুমায় শঙ্কর শীঘ্রচেতন।
বসি পাদ চাপি করে রাত্রি-জাগরণ ॥ ৬৯
তার ভয়ে নারে প্রভু বাহিরে যাইতে।
তার ভয়ে নারে ভিত্ত্যে মুখাব্জ ঘষিতে ॥ ৭০
এই লীলা মহাপ্রভুর রঘুনাথদাস।
গৌরাঙ্গস্তব-কল্পবৃক্ষে করিয়াছে প্রকাশ ॥ ৭১

তথাহি স্তবাবল্যাং গৌরাঙ্গস্তব-
কল্পতরৌ (৬)—

স্বকীয়স্য প্রাণার্ব্বুদসদৃশগোষ্ঠস্য বিরহাৎ
প্রলাপাহুন্মাদাৎ সততমতিকুর্ব্বন্ বিকলধীঃ।
দধদ্ভিত্তৌ শশ্বদ্বদনবিধুঘর্ষেণ রুধিরং
ক্ষতোত্থং গৌরাঙ্গো হৃদয়ে উদয়ন্ মাং মদয়তি ॥ ৫

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

স্বকীয়স্য নিজস্য প্রাণার্ব্বুদসদৃশস্য প্রাণেন্দ্রিয়াদিতুল্যস্য গোষ্ঠস্য ব্রজস্য বিরহাৎ অদর্শনাৎ উন্মাদাৎ মহাভাবাত্মাদয়াৎ সততং প্রলাপান্ কুর্ব্বন্ বিকলধীঃ ভিত্তৌ প্রাচীরে শশ্বন্নিরন্তরং বদনবিধুঘর্ষেণ মুখচন্দ্রঘর্ষেণ ক্ষতোত্থং রুধিরং দধৎ গৌরাঙ্গঃ হৃদয়ে উদয়ন্ মাং মদয়তি উন্মত্তীকরোতি। শ্লোকমালা। ৫

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

খালি গায়ে শঙ্কর ঘুমাইয়া থাকেন; তাহা দেখিয়া ভক্তবৎসল প্রভু উঠিয়া নিজের গায়ের কাঁথাখানি শঙ্করের গায়ে চাদরের মত করিয়া বিছাইয়া দিতেন—শঙ্করের শীতনিবারণের নিমিত্ত।

"ওড়ায়" স্থানে "জড়ায়" পাঠান্তরও আছে।

জড়ায়—গায়ে জড়াইয়া দেন।

৬৯। **শীঘ্রচেতন**—শীঘ্রই যাঁহার চেতন হয়; শীঘ্রই যিনি ঘুম হইতে জাগিয়া উঠেন। **নিরন্তর ঘুমায়** ইত্যাদি—নিরন্তর (সর্ব্বদাই) এইরূপ হয় যে, শঙ্কর ঘুমাইয়া পড়েন বটে, কিন্তু শীঘ্রই আবার ঘুম হইতে জাগিয়া উঠেন; তিনি কখনও সমস্ত রাত্রি ঘুমাইয়া কাটান না। **বসি পাদ চাপি** ইত্যাদি—ঘুম হইতে শীঘ্র জাগিয়া উঠিয়া বসিয়া বসিয়া প্রভুর পাদ-সংবাহন করিয়া (পা চাপিয়া) রাত্রি জাগরণ করেন (শঙ্কর)। **পাদ চাপি**—গ্লানি দূর করিবার নিমিত্ত এবং শীঘ্র ঘুম পাড়াইবার নিমিত্ত শঙ্কর আস্তে আস্তে প্রভুর পা চাপিতেন।

৭০। **তার ভয়ে**—শঙ্করপণ্ডিতের ভয়ে, পাছে শঙ্কর বাধা দেন বা কিছু বলেন। **ভিত্ত্যে**—ভিত্তিতে। **মুখাব্জ**—প্রভুর মুখ-কমল; প্রভুর কমলের ন্যায় সুকোমল বদন।

৭১। রঘুনাথদাস-গোস্বামী স্বরচিত শ্রীগৌরাঙ্গ-স্তব-কল্পতরুগ্রন্থে প্রভুর মুখ-সংঘর্ষণ-লীলা বর্ণন করিয়াছেন; তদবলম্বনেই কবিরাজগোস্বামী এই লীলা বর্ণন করিয়াছেন। দাস-গোস্বামীর রচিত শ্লোক প্রমাণ-স্বরূপে নিম্নে উদ্ধৃত হইয়াছে।

শ্লো। ৫। **অন্বয়**। স্বকীয়স্য (স্বীয়) প্রাণার্ব্বুদসদৃশগোষ্ঠস্য (প্রাণার্ব্বুদসদৃশগোষ্ঠের) বিরহাৎ (বিরহে) উন্মাদাৎ (উন্মত্ত হইয়া) সততং (সর্ব্বদা) প্রলাপান্ অতিকুর্ব্বন্ (যিনি অতিশয় প্রলাপ করিতেন) বিকলধীঃ (এবং বিকলবুদ্ধিবশতঃ) ভিত্তৌ (ভিত্তিতে) বদনবিধুঘর্ষেণ (মুখচন্দ্রের ঘর্ষণহেতু) ক্ষতোত্থং রুধিরং (ক্ষত হইতে নির্গত রুধির) শশ্বৎ (নিরন্তর) দধৎ (যিনি ধারণ করিতেন, সেই) গৌরাঙ্গঃ (শ্রীগৌরাঙ্গদেব) হৃদয়ে (হৃদয়ে) উদয়ন্ (উদিত হইয়া) মাং (আমাকে) মদয়তি (উন্মত্ত বা ব্যাকুল করিতেছেন)।

অনুবাদ। যিনি স্বকীয় প্রাণার্ব্বুদ-সদৃশ গোষ্ঠের (বৃন্দাবনের) বিরহে উন্মত্ত হইয়া সর্ব্বদা অতিশয় প্রলাপ করিতেন, এবং উন্মাদ-জনিত বিকল-বুদ্ধিবশতঃ ভিত্তিতে মুখ-সংঘর্ষণ-হেতু যাঁহার মুখক্ষত হইতে নিরন্তর রুধিরধারা নির্গত হইত, সেই শ্রীগৌরাঙ্গদেব হৃদয়ে উদিত হইয়া আমাকে অতিশয় ব্যাকুল করিতেছেন। ৫

প্রাণার্ব্বুদসদৃশগোষ্ঠস্য—প্রাণার্ব্বুদের (কোটি কোটি প্রাণের) সদৃশ প্রিয় যে গোষ্ঠ (বৃন্দাবন), তাহার। লোকের নিকটে নিজের প্রাণ যতটুকু প্রিয়, তাহা অপেক্ষা কোটি কোটিগুণে প্রিয় ছিল গোষ্ঠ বা বৃন্দাবন—

এইমত মহাপ্রভু রাত্রি-দিবসে।
প্রেমসিন্ধুমগ্ন রহে, কভু ডুবে ভাসে ॥ ৭২
এককালে বৈশাখের পৌর্ণমাসীদিনে।
রাত্রিকালে মহাপ্রভু চলিলা উদ্যানে ॥ ৭৩
জগন্নাথবল্লভনাম উদ্যান-প্রধানে।
প্রবেশ করিল প্রভু লঞা ভক্তগণে ॥ ৭৪
প্রফুল্লিত বৃক্ষ-বল্লী—যেন বৃন্দাবন।
শুক সারী পিক ভৃঙ্গ করে আলাপন ॥ ৭৫
পুষ্পগন্ধ লঞা বহে মলয়পবন।
গুরু হঞা তরুলতা শিখায় নর্ত্তন ॥ ৭৬
পূর্ণচন্দ্রচন্দ্রিকায় পরম উজ্জ্বল।
তরুলতা জ্যোৎস্নায় করে ঝলমল ॥ ৭৭
ছয়ঋতুগণ যাহাঁ বসন্তপ্রধান।
দেখি আনন্দিত হৈল গৌর ভগবান্ ॥ ৭৮

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

প্রভুর নিকটে; সেই বৃন্দাবনের বিরহে—বৃন্দাবনবিহারী শ্রীকৃষ্ণের বিরহে **উন্মাদাৎ**—বিরহজনিত দিব্যোন্মাদবশতঃ প্রভু সর্ব্বদাই নানাবিধরূপে প্রলাপ করিতেন; এবং ঐ দিব্যোন্মাদবশতঃ তাঁহার বুদ্ধিও যেন বিকলতাপ্রাপ্ত হইয়াছিল; তাই তিনি গম্ভীরার **ভিত্তৌ**—ভিত্তিতে, প্রাচীরে, দেওয়ালে স্বীয় মুখচন্দ্র ঘর্ষণ করিতেন (৩।১৯।৫৫ পয়ার); তাহার ফলে মুখে ক্ষত হইত; এই ক্ষত হইতে সর্ব্বদা রক্তস্রাব হইত (৩।১৯।৫৬ পয়ার)।

৫৫-৫৭ পয়ারোক্ত লীলার প্রমাণ এই শ্লোক।

৭২। **কভু ডুবে**—প্রভু কখনও কখনও প্রেমসিন্ধুতে ডুবিয়া যান; রাধাপ্রেমাবেশে সম্পূর্ণরূপে বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া পড়েন।

ভাসে—কভু ভাসেন (প্রভু); প্রভু কখনও কখনও বা প্রেমসিন্ধুতে ভাসিয়া উঠেন; অর্দ্ধবাহ্য দশা প্রাপ্ত হয়েন। কিন্তু সকল সময়েই প্রেমসিন্ধুর মধ্যে থাকেন—সকল সময়েই রাধাপ্রেমের আবেশ থাকে।

৭৩। **এক কালে**—এক সময়ে। **পৌর্ণমাসীদিনে**—পূর্ণিমায়।

৭৪-৭৫। চারি পয়ারে জগন্নাথবল্লভ-নামক উদ্যানের বর্ণনা দিতেছেন।

প্রফুল্লিত বৃক্ষবল্লী—উদ্যানের সমস্ত বৃক্ষ এবং লতাই প্রস্ফুটিত পুষ্পসমূহে মণ্ডিত হইয়া আছে। **যেন বৃন্দাবন**—দেখিলে বৃন্দাবন বলিয়া মনে হয়। বৃন্দাবনের সমস্ত বৃক্ষ এবং লতাই সর্ব্বদা পুষ্পিত থাকে। **পিক**—কোকিল। **ভৃঙ্গ**—ভ্রমর।

উদ্যানে শুক, সারী, কোকিলাদি পক্ষিগণ মধুরকণ্ঠে শব্দ করিতেছে, আর ভ্রমরও মধুর গুঞ্জন করিতেছে।

৭৬। **পুষ্পগন্ধ লঞা** ইত্যাদি—প্রস্ফুটিত পুষ্পসমূহ হইতে সুগন্ধ গ্রহণ করিয়া মলয়-পবন প্রবাহিত হইতেছে। **মলয়-পবন**—দক্ষিণ দিক্স্থিত মলয়-নামক চন্দন-বৃক্ষ-বহুল পর্ব্বত হইতে আগত বায়ু; ইহা সুখস্পর্শ। **গুরু হঞা**—মলয়-পবন—গুরু হইয়া (যেন গুরু রূপে)। **তরুলতা**—তরু (বৃক্ষ) ও লতাকে। **শিখায়**—শিক্ষা দেয় (মলয় পবন)। **নর্ত্তন**—নৃত্য। **গুরু হঞা** ইত্যাদি—উদ্যানে মলয়-পবন প্রবাহিত হইতেছে, তাহাতে উদ্যানস্থ সমস্ত বৃক্ষ-লতাই একটু একটু দুলিতেছে; মনে হইতেছে যেন, বৃক্ষ-লতা নৃত্য অভ্যাস করিতেছে—মলয়-পবনই যেন নৃত্য-শিক্ষার গুরু হইয়া তাহাদিগকে নৃত্য শিক্ষা দিতেছে।

৭৭। **পূর্ণচন্দ্র-চন্দ্রিকায়**—পূর্ণচন্দ্রের জ্যোৎস্নায়। **পরম উজ্জ্বল**—পূর্ণচন্দ্রের জ্যোৎস্নায় সমস্ত উদ্যান অত্যন্ত উজ্জ্বল হইয়াছে। **তরুলতা জ্যোৎস্নায়** ইত্যাদি—পূর্ণচন্দ্রের জ্যোৎস্নায় উদ্যানের সমস্ত বৃক্ষলতা ঝলমল করিতেছে।

৭৮। **ছয়ঋতু**—গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত, শীত ও বসন্ত, এই ছয় ঋতু। **যাহাঁ**—যে স্থানে, যে উদ্যানে। **বসন্ত-প্রধান**—বসন্তই প্রধান যাহাদের (যে ছয় ঋতুর)।

এই পয়ারের অন্বয়ঃ—যাহাঁ (যে উদ্যানে) বসন্ত-প্রধান ছয় ঋতুকে দেখিয়া গৌর ভগবান্ আনন্দিত হইলেন।

'ললিত-লবঙ্গলতা' পদ গাওয়াইয়া।
নৃত্য করি বুলে প্রভু নিজ-গণ লৈয়া ॥ ৭৯
প্রতিবৃক্ষবল্লী ঐছে ভ্রমিতে ভ্রমিতে।
অশোকের তলে কৃষ্ণ দেখে আচম্বিতে ॥ ৮০
কৃষ্ণ দেখি মহাপ্রভু ধাইয়া চলিলা।
আগে দেখি হাসি কৃষ্ণ অন্তর্দ্ধান হৈলা ॥ ৮১
আগে পাইলা কৃষ্ণ, তারে পুন হারাইয়া।
ভূমিতে পড়িলা প্রভু মূর্চ্ছিত হইয়া ॥ ৮২
কৃষ্ণের শ্রীঅঙ্গগন্ধে ভরিয়াছে উদ্যান।
সেই গন্ধ পাঞা প্রভু হৈলা অচেতন ॥ ৮৩

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

ভগবান্ গৌরসুন্দরের অলৌকিক প্রভাবে, সেই রাত্রিতে জগন্নাথবল্লভ উদ্যানে ছয় ঋতুই যুগপৎ বিরাজিত ছিল; কিন্তু ছয় ঋতু বিরাজিত থাকিলেও বসন্ত-ঋতুই সকলের উপরে প্রাধান্য বিস্তার করিয়াছিল; ভগবানের অচিন্ত্য-শক্তির প্রভাবে শীত-গ্রীষ্মাদি ঋতুতেও বসন্তের প্রভাবই লক্ষিত হইয়াছিল।

এই পয়ারে গৌরের বিশেষণরূপে "ভগবান্" শব্দ-প্রয়োগের তাৎপর্য্য এই যে, সাধারণতঃ একই স্থানে একই সময়ে ছয়ঋতুর অবস্থান সম্ভব নয়; আবার এক ঋতুর মধ্যে অন্য ঋতুর প্রভাব লক্ষিত হওয়াও সম্ভব নয়। শ্রীগৌর-সুন্দরের ভগবত্তার প্রভাবেই ইহা সম্ভব হইয়াছে; ছয়ঋতুই যেন শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের সেবার নিমিত্ত যুগপৎ উপস্থিত হইয়াছে।

৭৯। **ললিত-লবঙ্গ-লতা-পদ**—ইহা শ্রীশ্রীগীতগোবিন্দ-গ্রন্থের প্রথম সর্গের একটী গীতের প্রথম পদ। পদটী বসন্তরাস-সম্বন্ধে; এস্থলে উক্ত গীতটীর ধুয়া উদ্ধৃত হইল:—"ললিত-লবঙ্গলতা-পরিশীলন-কোমল-মলয়-সমীরে মধুকর-নিকর-করম্বিত-কোকিল-কূজিত-কুঞ্জ-কুটীরে। বিহরতি হরিরিহ সরস-বসন্তে নৃত্যতি যুবতি-জনেন সমং সখি বিরহিজনস্য দুরন্তে ॥—যে স্থানে ললিত-লবঙ্গ-লতার আলিঙ্গন-লব্ধ কোমলত্ব লইয়া মলয়-সমীরণ প্রবাহিত হইতেছে, যে স্থানে মধুকর-সমূহ মধুর গুঞ্জন করিতেছে এবং কোকিলসমূহ কূজন করিতেছে, সেই কুঞ্জকুটীরে—বিরহিজনের দুঃখপ্রদ-সরসবসন্ত-সময়ে—শ্রীহরি যুবতি-জনের সহিত নৃত্য বিহার করিতেছেন।"

গাওয়াইয়া—গান করাইয়া (স্বরূপ-দামোদরাদি-দ্বারা); প্রভুর আদেশে স্বরূপ-দামোদরাদি ললিত-লবঙ্গ-লতা-পদ কীর্ত্তন করিলেন। আর প্রভু তাহা শুনিতে শুনিতে স্বীয় পার্ষদ-ভক্তগণের সঙ্গে উদ্যান-মধ্যে নৃত্য করিয়া ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। রাধাভাবাবিষ্ট প্রভু "ললিত-লবঙ্গ-লতা" পদ শুনিয়া বসন্ত-রাসের ভাবেই বোধহয় আবিষ্ট হইয়াছিলেন; সেই ভাবে নিজেকে শ্রীরাধা এবং সঙ্গীয় ভক্তগণকে সখীমণ্ডলী মনে করিয়া আর জগন্নাথবল্লভ-উদ্যানকে বৃন্দাবন মনে করিয়াই বোধহয় নৃত্য করিতেছিলেন। ইহা উদ্‌ঘূর্ণার লক্ষণ।

৮০। **প্রতিবৃক্ষবল্লী**—প্রত্যেক বৃক্ষ ও প্রত্যেক লতা। **ঐছে**—ঐরূপে, নিজগণ লইয়া। **অশোকের তলে**—অশোক গাছের নীচে। প্রভু নিজগণকে সঙ্গে করিয়া প্রত্যেক গাছের এবং প্রত্যেক লতার নীচে নৃত্য করিয়া ঘুরিতেছিলেন; এইরূপে ভ্রমণ করিতে করিতে হঠাৎ দেখিলেন যে, একটি অশোক গাছের নীচে শ্রীকৃষ্ণ দাঁড়াইয়া আছেন।

৮১। শ্রীকৃষ্ণকে দেখিয়া মহাপ্রভু দৌড়িয়া দ্রুতবেগে তাঁহার দিকে অগ্রসর হইলেন। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ সম্মুখের দিকে চাহিয়াই প্রভুকে দেখিয়া ঈষৎ হাস্য করিয়া অন্তর্হিত হইলেন, আর কৃষ্ণকে দেখা গেল না।

আগে দেখি—সম্মুখের দিকে চাহিয়া। **অন্তর্দ্ধান হৈলা**—অন্তর্হিত হইলেন, আর তাঁহাকে দেখা গেল না।

৮২। কৃষ্ণকে সাক্ষাতে পাইয়াছিলেন; কিন্তু পাইয়াও পুনরায় তাঁহাকে হারাইয়া তাঁহার বিরহ-যন্ত্রণায় প্রভু মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন।

৮৩। শ্রীকৃষ্ণ অন্তর্হিত হইয়াছেন বটে, কিন্তু তিনি চলিয়া গেলেও তাঁহার শ্রীঅঙ্গের সুগন্ধে সমস্ত উদ্যান ভরপুর হইয়াছিল; ঐ গন্ধ প্রভুর নাসিকায় প্রবেশ করিতেই প্রভু হতজ্ঞান হইয়া পড়িলেন।

নিরন্তর নাসায় পৈশে কৃষ্ণ-পরিমল।
গন্ধ আস্বাদিতে প্রভু হইলা পাগল॥ ৮৪

কৃষ্ণগন্ধলুব্ধ রাধা সখীকে যে কহিলা।
সেই শ্লোক পড়ি প্রভু অর্থ করিলা॥ ৮৫

তথাহি গোবিন্দলীলামৃতে (৮।৬)—
কুরঙ্গমদজিদ্বপুঃপরিমলোর্ম্মিকৃষ্টাঙ্গনঃ
স্বকাঙ্গনলিনাষ্টকে শশিযুতাজগন্ধপ্রথঃ।
মদেন্দুবরচন্দনাগুরুসুগন্ধিচর্চ্চার্চ্চিতঃ
স মে মদনমোহনঃ সখি তনোতি নাসাস্পৃহাম্॥ ৬

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

স কৃষ্ণো মম নাসাস্পৃহাং তনোতি স্বসৌরভেনেতি শেষঃ। কুরঙ্গমদো মৃগমদস্তজ্জিদ্বপুষঃ পরিমলোর্ম্মিভিঃ আকৃষ্টাঃ অঙ্গনা উত্তমা নার্য্যো যেন সঃ। স্বকীয়াঙ্গরূপ-নলিনাষ্টকে পাদদ্বয়-করদ্বয়-নেত্রদ্বয়-নাভিমুখরূপাষ্টকমলেষু শশিঃ কর্পূরঃ তদ্যুতাজস্য গন্ধং প্রথয়তি বিস্তারয়তি যঃ সঃ। মদঃ কস্তূরীচ ইন্দুঃ কর্পূরশ্চ বরচন্দনঞ্চ অগুরুঃ কৃষ্ণাগুরুশ্চ এতৈঃ কৃতাভিঃ সুগন্ধিবিশিষ্ট-চর্চ্চাভিরঙ্গলেপকৈরর্চ্চিতো লিপ্তঃ। সদানন্দবিধায়িনী। ৬

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

৮৪। ক্ষণপরেই বোধ হয় প্রভুর মূর্চ্ছা ভঙ্গ হইল, তখনও শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গগন্ধে উদ্যান পরিপূর্ণ; প্রভুর নাসিকায় নিরন্তরই সেই অপূর্ব্বগন্ধ প্রবেশ করিতেছে; সেই চিত্তোন্মাদক-গন্ধ আস্বাদন করিয়া শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলনের উৎকণ্ঠায় রাধাভাবাবিষ্ট প্রভু উন্মত্তের ন্যায় হইয়া পড়িলেন।

পৈশে—প্রবেশ করে। **কৃষ্ণ-পরিমল**—কৃষ্ণের অঙ্গগন্ধ। **পাগল**—শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলিত হইয়া সাক্ষাদ্‌ভাবে তাঁহার অঙ্গগন্ধ আস্বাদনের লোভে উন্মত্তের মত হইলেন।

৮৫। **কৃষ্ণ-গন্ধ-লুব্ধ**—শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গগন্ধ আস্বাদনের নিমিত্ত লালসান্বিতা। **সেই শ্লোক**—যে শ্লোকে শ্রীরাধা নিজ সখীর নিকটে নিজের কৃষ্ণাঙ্গ-গন্ধ-লুব্ধতার কথা বলিয়াছেন; নিম্নোদ্ধৃত "কুরঙ্গ-মদজিদ্বপুঃ" ইত্যাদি শ্লোক।

শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গগন্ধ আস্বাদনের নিমিত্ত লালসান্বিতা হইয়া শ্রীরাধা যে শ্লোকে নিজ সখীর নিকট নিজের মনোগতভাব ব্যক্ত করিয়াছিলেন, শ্রীরাধার ভাবে আবিষ্ট মহাপ্রভুও শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গগন্ধলুব্ধ হইয়া সেই শ্লোকই উচ্চারণ করিলেন এবং পরে প্রলাপে তাহার অর্থ করিলেন।

শ্লো। ৬। অন্বয়। অন্বয় সহজ।

অনুবাদ। শ্রীরাধা কহিলেন—হে সখি! মৃগমদবিজয়ী শ্রীঅঙ্গের পরিমলোর্ম্মিদ্বারা যিনি ব্রজাঙ্গনাগণকে আকর্ষণ করেন, যিনি আপনার অঙ্গরূপ অষ্টপদ্মে (নেত্রদ্বয়, করদ্বয়, পদদ্বয়, নাভি ও মুখ) কর্পূরযুক্ত পদ্মের গন্ধ বিস্তার করিতেছেন, এবং যিনি মৃগমদ, কর্পূর, বরচন্দন এবং কৃষ্ণাগুরু প্রভৃতি সুগন্ধিদ্রব্যদ্বারা স্বীয় অঙ্গ চর্চ্চিত করেন, সেই মদন-মোহন আমার নাসিকার স্পৃহা বিস্তার করিতেছেন। ৬

কুরঙ্গমদজিদ্বপুঃপরিমলোর্ম্মিকৃষ্টাঙ্গনঃ—কুরঙ্গমদকে (মৃগমদকে, কস্তূরীকে) জয় করে, সুগন্ধে পরাভূত করে, এমন যে বপুঃপরিমল (বপুর বা দেহের পরিমল বা সুগন্ধ), তাহার উর্ম্মি (তরঙ্গ) দ্বারা আকৃষ্ট হয় অঙ্গনাগণ যৎকর্ত্তৃক; যাঁহার অঙ্গগন্ধের তুলনায় কস্তূরীর সুগন্ধও নগণ্য, সেই কৃষ্ণ স্বীয় অঙ্গগন্ধের তরঙ্গদ্বারা ব্রজাঙ্গনাগণকে স্বীয় সান্নিধ্যে আকর্ষণ করিয়া আনেন; তাঁহার অঙ্গগন্ধে প্রলুব্ধ হইয়া ব্রজাঙ্গনাগণ তাঁহার নিকট আসিয়া উপস্থিত হন। উর্ম্মি শব্দের তাৎপর্য্য এই যে, জলের তরঙ্গ যেমন একটার পর আর একটা আসিয়া তীরকে বা জলমধ্যস্থ কোনও লোককে অনবরত আঘাত করে, তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গগন্ধও বায়ুর তরঙ্গে ভাসিয়া আসিয়া প্রতিক্ষণেই নাসিকাকে স্পর্শ করে—বায়ুর তরঙ্গ তো নয়, যেন অঙ্গগন্ধই তরঙ্গাকারে প্রতিক্ষণে ভাসিয়া আসিতেছে।

যথারাগঃ—

কস্তূরীলিপ্ত নীলোৎপল,　　তার যেই পরিমল,
তাহা জিনি কৃষ্ণ-অঙ্গগন্ধ।
ব্যাপে চৌদ্দ ভুবনে,　　করে সর্ব্ব-আকর্ষণে,
নারীগণের আঁখি করে অন্ধ ॥ ৮৬

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

স্বকাঙ্গনলিনাষ্টকে—স্বক (স্বকীয়) অঙ্গরূপ (পদদ্বয়, করদ্বয়, নয়নদ্বয়, নাভি ও মুখ - এই আটটী অঙ্গরূপ) নলিনাষ্টকে আটটী পদ্মে **শশিযুতাব্জগন্ধপ্রথঃ**—শশি (কর্পূর) যুক্ত অব্জের (পদ্মের) গন্ধ প্রথিত বা বিস্তারিত করেন যিনি। শ্রীকৃষ্ণের দুই চরণ, দুই হস্ত, দুই নয়ন, নাভি ও মুখ—এই আটটী অঙ্গকে আটটী পদ্ম বলা হইয়াছে—পদ্মের ন্যায় সুন্দর, স্নিগ্ধ, কোমল এবং সুগন্ধি বলিয়া; পদ্মের গন্ধের সহিত কর্পূরের গন্ধ মিশ্রিত হইলে যে একটী স্নিগ্ধ মধুর গন্ধের উদ্ভব হয়, শ্রীকৃষ্ণের উক্ত আটটী অঙ্গ হইতেও সর্ব্বদা তদ্রূপ মনোরম গন্ধ প্রসারিত হইতে থাকে।

মদেন্দুবরচন্দনাগুরুসুগন্ধিচর্চ্চার্চ্চিতঃ—মদ (মৃগমদ বা কস্তুরী), ইন্দু (কর্পূর), বরচন্দন (উৎকৃষ্ট চন্দন) ও অগুরু (কৃষ্ণাগুরু) এ সমস্ত দ্বারা সুগন্ধি (সুগন্ধবিশিষ্ট) যে চর্চ্চা (অঙ্গলেপ), তদ্দ্বারা যিনি (যাঁহার অঙ্গ) চর্চ্চিত (অনুলিপ্ত) হয়; সেই মদনমোহন। শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গ একটী অতিসুগন্ধি অঙ্গলেপ দ্বারা লিপ্ত; কস্তুরী, কর্পূর, চন্দন ও কৃষ্ণাগুরু দ্বারা সেই অনুলেপকে সুগন্ধি করা হইয়াছে।

পরবর্ত্তী ত্রিপদীসমূহে এই শ্লোকের তাৎপর্য্য বিবৃত হইয়াছে।

৮৬। ত্রিপদী-সমূহে "কুরঙ্গ-মদ-জিদ্বপুঃ" ইত্যাদি শ্লোকের মহাপ্রভু-কৃত অর্থ ব্যক্ত হইতেছে।

প্রথমে "কুরঙ্গ-মদ-জিদ্বপুঃপরিমলোর্ম্মিকৃষ্টাঙ্গনঃ" অংশের অর্থ করিতেছেন "কস্তূরীলিপ্ত নীলোৎপল" ইত্যাদি ত্রিপদী সমূহে।

কস্তূরী—মৃগনাভি। **নীলোৎপল**—নীলপদ্ম। **কস্তূরীলিপ্ত নীলোৎপল**-কস্তুরী দ্বারা আবৃত নীলপদ্ম। কস্তুরী ও নীলপদ্ম, ইহাদের প্রত্যেকের সুগন্ধই অত্যন্ত মনোরম; উভয়ের মিশ্রণে যে অপূর্ব্ব সুগন্ধের উৎপত্তি হয়, তাহা অনির্ব্বচনীয়। "কস্তূরীলিপ্ত" স্থলে "কস্তুরিকা" পাঠান্তরও আছে। **তার**—কস্তুরী-লিপ্ত নীলোৎপলের। **পরিমল**—গন্ধ। **তাহা জিনি**—কস্তুরী-লিপ্ত নীলোৎপলের গন্ধকেও পরাজিত করিয়া। **ব্যাপে**—ব্যাপ্ত হয় (কৃষ্ণাঙ্গ-গন্ধ)। **আঁখি**—চক্ষু। **নারীগণের আঁখি করে অন্ধ**—কৃষ্ণের অঙ্গগন্ধ নারীগণের চক্ষুকে অন্ধ করিয়া দেয়, তাঁহাদের চক্ষুর শক্তি যেন নষ্ট করিয়া দেয়। শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গ-গন্ধ এতই মনোহর যে, সেই গন্ধ যখন নারীগণের নাসায় প্রবেশ করে, তখন ঐ গন্ধ আস্বাদনের নিমিত্তই তাঁহাদের সমস্ত মনোবৃত্তিই যেন কেন্দ্রীভূত হইয়া যায়—নয়নাদি ইন্দ্রিয়ের কার্য্যনির্ব্বাহার্থ মনোবৃত্তির যে অংশ নিয়োজিত হইয়াছিল, তাহাও যেন আসিয়া নাসিকার বৃত্তির সহিত মিলিত হইয়া যায়। এই অবস্থায় নারীগণ তন্ময়ভাবে নিমীলিত-নয়নে কেবল গন্ধই অনুভব করিতে থাকেন। গন্ধ-আস্বাদনের নিমিত্ত চক্ষু নিমীলিত (অন্ধের ন্যায়) হইয়া যায় বলিয়াই বোধ হয় বলা হইয়াছে—কৃষ্ণ-অঙ্গগন্ধ নারীগণের চক্ষুকে অন্ধ করে।

রাধাভাবাবিষ্ট মহাপ্রভু পার্শ্ববর্ত্তী রায়-রামানন্দাদিকে সখী মনে করিয়া বলিলেন—"সখি! শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গ-গন্ধের মনোহারিত্বের কথা আর কি বলিব! কিসের সঙ্গেই বা তাহার তুলনা দিয়া বুঝাইব! কৃষ্ণাঙ্গগন্ধের তুলনা কৃষ্ণাঙ্গগন্ধই—ইহার আর অন্য তুলনা জগতে নাই। সখি! আমাদের পরিচিত অন্য যত সুগন্ধি বস্তু আছে, তাদের মধ্যে কস্তুরী এবং নীলোৎপলই সুগন্ধে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ; কিন্তু কৃষ্ণাঙ্গগন্ধের নিকটে ইহারা অতি তুচ্ছ! ইহাদের প্রত্যেকের কথা তো দূরে, নীলোৎপলের উপরে সর্ব্বতোভাবে কস্তুরী লেপিয়া দিলে—কস্তূরী ও নীলোৎপলের মিলিত সুগন্ধে—যে একটী পরম মধুর অপূর্ব্ব সুগন্ধের উৎপত্তি হয়, শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গ-গন্ধের নিকটে তাহাও পরাজিত! শ্রীকৃষ্ণের এই অনির্ব্বচনীয় অঙ্গগন্ধ, শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গ হইতে উত্থিত হইয়া যেন চতুর্দ্দশ-ভুবনকে ভরপুর করিয়া থাকে, আর সকলের

সখি হে ! কৃষ্ণগন্ধ জগত মাতায়।
নারীর নাসায় পৈশে, সর্ব্বকাল তাহাঁ বৈসে,
কৃষ্ণ-পাশে ধরি লঞা যায় ॥ ধ্রু ॥ ৮৭

নেত্র নাভি বদন, করযুগ চরণ,
এই অষ্ট পদ্ম কৃষ্ণ-অঙ্গে।
কর্পূরলিপ্ত কমল, তার যৈছে পরিমল,
সেই গন্ধ অষ্টপদ্ম-সঙ্গে ॥ ৮৮

হেমকীলিত চন্দন, তাহা করি ঘর্ষণ,
তাহে অগুরু কুঙ্কুম কস্তুরী।
কর্পূরসনে চর্চ্চা অঙ্গে, পূর্ব্ব অঙ্গের গন্ধ সঙ্গে,
মিলি ডাকা যেন কৈল চুরি ॥ ৮৯

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

চিত্তকে শ্রীকৃষ্ণের দিকে প্রবল শক্তিতে আকর্ষণ করিতে থাকে। সখি! এই গন্ধ নারীগণের উপর একটী অদ্ভুত ক্রিয়া প্রকাশ করিয়া থাকে; শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গগন্ধ নারীগণের নাসিকায় প্রবেশ করিলে, তাহার মনোহারিত্বে তাঁহারা এতই মুগ্ধ হইয়া যান যে, তাঁহারা অন্ধের ন্যায় নয়ন নিমীলিত করিয়া যেন সমস্ত ইন্দ্রিয়বৃত্তিকেই নাসিকায় কেন্দ্রীভূত করিয়া তন্ময়ভাবে শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গসৌরভ আস্বাদন করিতে থাকেন।”

৮৭। **সখি হে**—রাধাভাবে শ্রীমন্মহাপ্রভু পার্শ্ববর্ত্তী রায়-রামানন্দাদিকে সখী বলিয়া সম্বোধন করিতেছেন। **মাতায়**—মত্ত করে। **পৈশে**—প্রবেশ করিয়া। **সর্ব্বকাল তাহা বৈসে**—শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গগন্ধ সর্ব্বদাই নারীর নাসায় বসিয়া থাকে; যে নারী একবার শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গগন্ধ অনুভব করেন, সর্ব্বদাই যেন তাঁহার মনে হয় যে, ঐ পরম-রমণীয় গন্ধ সর্ব্বদাই তিনি অনুভব করিতেছেন। **কৃষ্ণ-পাশে** ইত্যাদি—শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গগন্ধ নারীর নাসায় প্রবেশ করিয়া, যেন নাকে দড়ি দিয়াই, সেই নারীকে কৃষ্ণের নিকটে ধরিয়া লইয়া যায়; অর্থাৎ যে নারী একবার কৃষ্ণের অঙ্গগন্ধ অনুভব করেন, তিনি আর কৃষ্ণের নিকটে ছুটিয়া না যাইয়া থাকিতে পারেন না।

“সখি! শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গগন্ধ তাহার মনোহারিতায় জগৎকে যেন মত্ত করিয়া ফেলে। ইহা নারীর নাসিকায় প্রবেশ করিয়া যেন নাসিকার মধ্যেই বাসা করিয়া স্থায়িভাবে বাস করিতে থাকে; আর যেন নাকে দড়ি দিয়া নারীকে কৃষ্ণের নিকটে টানিয়া লইয়া যায়।”

৮৮। এক্ষণে শ্লোকস্থ “স্বকাঙ্গনলিনাষ্টকে শশিযুতাব্জগন্ধপ্রথঃ” অংশের অর্থ করিতেছেন, “নেত্র নাভি” ইত্যাদি ত্রিপদীতে।

নেত্র—চক্ষু। **করযুগ**—দুইটী হাত।

অষ্টপদ্ম—আটটী পদ্ম; শ্রীকৃষ্ণের দুইটী চক্ষু দুইটী পদ্ম, নাভি একটী পদ্ম, বদন (মুখ) একটী পদ্ম, দুইটী হাত দুইটী পদ্ম এবং দুই চরণ দুই পদ্ম; শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গে মোট এই আটটী পদ্ম। পদ্মের ন্যায় সুন্দর, স্নিগ্ধ এবং সুগন্ধি বলিয়া এই আটটী অঙ্গকে পদ্মের সঙ্গে তুলনা করা হইয়াছে।

কর্পূরলিপ্ত—কর্পূর-চূর্ণদ্বারা মণ্ডিত। **কমল**—পদ্ম। **পরিমল**—সুগন্ধ। **অষ্টপদ্ম-সঙ্গে**—শ্রীকৃষ্ণের নেত্রাদি আটটী অঙ্গরূপ পদ্মে।

কমলকে কর্পূর দ্বারা লেপন করিলে ঐ পদ্মের যেরূপ সুগন্ধ হয়, শ্রীকৃষ্ণের নেত্রাদি আটটী অঙ্গেও সেইরূপ অপূর্ব্ব সুগন্ধ আছে।

৮৯। এক্ষণে শ্লোকস্থ “মদেন্দুবরচন্দনাগুরু-সুগন্ধিচর্চ্চার্চ্চিতঃ” অংশের অর্থ করিতেছেন—“হেমকীলিত চন্দন” ইত্যাদি ত্রিপদীতে।

হেম—স্বর্ণ। **কীলিত**—প্রোথিত, বদ্ধ।

হেমকীলিত চন্দন—সোনার হাতল-যুক্ত চন্দন। চন্দন অত্যন্ত শীতল; ঘষিবার সময় হাতে ধরিলে অত্যন্ত ঠাণ্ডা লাগে; তাতে ঘষিবার পক্ষে একটু অসুবিধা হয়। তাই চন্দনের যে স্থান ধরিয়া চন্দন ঘষা হয়, সেই

হরে নারীর তনুমন, নাসা করে ঘূর্ণন,
খসায় নীবী, ছুটায় কেশবন্ধ॥
করি আগে বাউরী, নাচায় জগত-নারী,
হেন ডাকাতি কৃষ্ণ-অঙ্গগন্ধ॥ ৯০

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

স্থান যদি সোনা দিয়া বাঁধাইয়া দেওয়া হয়, তবে ঘষিবার সময় চন্দনে হাত লাগে না, সোনাতেই হাত লাগে। এইরূপ সোনার হাতলযুক্ত চন্দনকে হেমকীলিত চন্দন বলে।

"হেমকীলিত চন্দন"-স্থলে "হিমকলিত চন্দন" পাঠও দৃষ্ট হয়। ইহার অর্থ হইবে—হিমের (কর্পূরের) সহিত কলিত (মিশ্রিত) চন্দন; কর্পূর-মিশ্রিত চন্দন। কিন্তু এই পাঠান্তর গ্রহণ করিলে একটী সমস্যা জাগে এই ত্রিপদীরই শেষার্দ্ধে লিখিত "কর্পূরসনে চর্চ্চা" বাক্য লইয়া। এই পাঠান্তর অনুসারে সমগ্র ত্রিপদীটির অর্থ হইবে এই:—কর্পূর মিশ্রিত চন্দন ঘর্ষণ করিয়া তাহাতে অগুরু, কুঙ্কুম, কস্তুরী ও কর্পূরের সঙ্গে রচিত যে অঙ্গ-চর্চ্চা (অঙ্গ-লেপন), তাহা পূর্ব্ব অঙ্গগন্ধের সঙ্গে মিলিয়া ইত্যাদি। "কর্পূর মিশ্রিত" চন্দনের সঙ্গে আবার "কর্পূর মিশ্রিত" করার প্রসঙ্গ আসিয়া পড়ে। দ্বিরুক্তি বলিয়া ইহা সমীচীন মনে হয় না।

তাহে—ঘৃষ্ট চন্দনে। **কর্পূরসনে**—কর্পূরের সঙ্গে। **চর্চ্চা**—লেপন (কর্পূরমিশ্রিত ঘৃষ্ট চন্দনের)। **অঙ্গে**—শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গে (কর্পূরমিশ্রিত চন্দন-চর্চ্চা)। **পূর্ব্ব অঙ্গের গন্ধ**—চন্দনচর্চ্চার পূর্ব্বে শ্রীকৃষ্ণাঙ্গের যে স্বাভাবিক গন্ধ ছিল, তাহা। **ডাকা**—ডাকাইত। **কৈল চুরি**—মনকে চুরি করিল।

সুশীতল এবং সুগন্ধি চন্দনের সঙ্গে অগুরু, কুঙ্কুম, কস্তুরী ও কর্পূরাদি পরমসুগন্ধি দ্রব্য মিশ্রিত করিয়া শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গে লেপন করা হয়; ইহাদের প্রত্যেকটী বস্তুই মনোরম গন্ধযুক্ত; ইহাদের মিলনে যে একটী অপূর্ব্ব সুগন্ধের উৎপত্তি হয়, তাহা একমাত্র অনুভবের বস্তু, ভাষায় তাহা প্রকাশ করা যায় না। আবার শ্রীকৃষ্ণের স্বাভাবিক অঙ্গগন্ধের সহিত ইহার মিলনে যে একটী অনির্ব্বচনীয় সুগন্ধের উদ্ভব হয়, তাহা যে কি বস্তু, তাহা কিরূপে জানাইব? তবে তাহার একটী অসাধারণ শক্তির কথা বলিতে পারি; ডাকাইত যেমন দ্বার ভাঙ্গিয়া লোকের গৃহে প্রবেশ করিয়া গৃহস্থের সাক্ষতেই গৃহের সমস্ত দ্রব্য চুরি করিয়া লইয়া যায়, গৃহস্থ কিছুতেই তাহাতে বাধা দিতে পারেনা; তদ্রূপ চন্দন, অগুরু, কস্তুরী ও কুঙ্কুমের গন্ধযুক্ত শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গগন্ধও কুলবতী রমণীদিগের নাসিকার ভিতর দিয়া—গৃহধর্ম্মের কঠোর আবরন ভেদ করিয়া—তাঁহাদের চিত্তকুঠরীতে প্রবেশ করে এবং সেইস্থান হইতে, তাঁহাদের চক্ষুর সাক্ষাতেই. তাঁহাদের লজ্জা, ধর্ম্ম, কুল, শীল, সংযম—এক কথায় তাঁহাদের যথাসর্ব্বস্ব চুরি করিয়া লইয়া যায়, তাঁহারা কোনরূপেই তাহাতে বাধা প্রদান করিতে সমর্থ হন না।

"মিলি ডাকা যেন কৈল চুরি" স্থানে কোনও কোনও গ্রন্থে "কামদেবের মন কৈল চুরি" এইরূপ পাঠও আছে। ইহার অর্থ—যে কামদেব জগতের সকলের মনকেই চুরি করে, যে কামদেবের মনকে অপর কেহ চুরি করিতে সমর্থ নহে, চন্দনাগুরুকুঙ্কুম-কস্তুরী-কর্পূর-চর্চ্চিত শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গগন্ধ সেই কামদেবের মনকেও চুরি করে, এতই তার প্রভাব।

আবার, "মিলি ডাক দিয়া করে চুরি" এবং "মেলি তাকে যেন কৈল চুরি" এরূপ পাঠান্তরও আছে; অর্থ সহজবোধ্য।

৯০। শ্রীকৃষ্ণাঙ্গগন্ধ যে রমণীকুলের লজ্জা-ধর্ম্মাদি চুরি করিয়া লইয়া যায়, তাহার নিদর্শন দেখাইতেছেন —"হরে নারীর" ইত্যাদি ত্রিপদীতে।

হরে নারীর তনুমন—শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গগন্ধ রমণী-কুলের দেহ এবং মন হরণ করে। ভাবার্থ এই যে, শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গগন্ধ একবার যে রমণীর নাসিকায় প্রবেশ করে, সেই রমণী মনপ্রাণ সমস্তই শ্রীকৃষ্ণকে অর্পণ করিতে বাধ্য হন, নিজাঙ্গদ্বারা শ্রীকৃষ্ণের প্রীতিবিধান করিতে উৎকণ্ঠিত হইয়া পড়েন।

সেই গন্ধের বশ নাসা, সদা করে গন্ধের আশা,
কভু পায় কভু নাহি পায়।
পাইলে পিয়া পেট ভরে, 'পিঙো পিঙো' তভু করে,
না পাইলে তৃষ্ণায় মরি যায়॥ ৯১

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

নাসা করে ঘূর্ণন—নাসিকাকে বিঘূর্ণিত করিয়া দেয় (অঙ্গগন্ধ); নাসিকাকে অন্য সকল গন্ধের দিক্ হইতে ঘুরাইয়া আনিয়া কেবল নিজের (কৃষ্ণাঙ্গ-গন্ধের) দিকেই ফিরাইয়া রাখে। ভাবার্থ এই যে, যে রমণী একবার কৃষ্ণাঙ্গগন্ধের আস্বাদ পান, তাঁহার নাসিকায় আর অন্য গন্ধ প্রবেশ করিতে পারেনা, তিনি সর্ব্বদাই নিজের নাসায় কেবল শ্রীকৃষ্ণাঙ্গগন্ধই অনুভব করিয়া থাকেন।

খসায় নীবী—কৃষ্ণাঙ্গ-গন্ধ রমণীদিগের নীবী (কটিবন্ধ) খসাইয়া দেয়; কন্দর্পোদ্রেকে তাঁহাদের নীবীবন্ধন শিথিল হইয়া যায়। **ছুটায় কেশবন্ধ**—কৃষ্ণাঙ্গগন্ধ রমণীদিগের কেশের (চুলের) বন্ধন ছুটাইয়া দেয়; ইহাও কন্দর্পোদ্রেকের লক্ষণ। **বাউরী**—পাগলিনী; হিতাহিতজ্ঞানশূন্যা ও অন্য বিষয়ে অনুসন্ধানশূন্যা। **হেন ডাকাতি**—এইরূপ ডাকাইতের ভাবাপন্ন। "হেন ডাকাতি কৃষ্ণ-অঙ্গ গন্ধ" স্থানে "হেন কৃষ্ণের ডাকাতিয়া গন্ধ" পাঠও আছে।

"কৃষ্ণাঙ্গগন্ধের আচরণ দুর্দ্দান্ত ডাকাইতের আচরণের তুল্য—তুল্য বলি কেন, ডাকাইতের আচরণ অপেক্ষাও ভীষণতর। ডাকাইত কেবল গৃহের দ্রব্যসামগ্রীই লইয়া যায়, গৃহ নেয়না; কিন্তু কৃষ্ণাঙ্গগন্ধরূপ অদ্ভুত ডাকাইত, রমণীকুলের লজ্জাধর্ম্মাদি সম্পত্তিও চুরি করে এবং লজ্জাধর্ম্মাদির আশ্রয়ীভূত (গৃহস্বরূপ) দেহটীকেও হরণ করিয়া নিয়া শ্রীকৃষ্ণের নিকটে অর্পণ করে। লজ্জা এবং আর্য্যপথ—এই দুইটীই হইল রমণীর প্রধান সম্পত্তি; কুলবতী রমণীগণ এই দুইটি সম্পত্তি রক্ষার নিমিত্ত অম্লানবদনে অগ্নিকুণ্ডাদিতে প্রবেশ করিয়াও প্রাণত্যাগ করিতে পারেন। এই দুইটিই যদি রমণী হারান, তাহা হইলে তাঁহার আর কি থাকে সখি? ডাকাতিয়া কৃষ্ণাঙ্গ-গন্ধের হস্তে রমণীদের এই অবস্থাই ঘটিয়াছে—তাঁহারা সর্ব্বস্বহারা হইয়াছেন। ডাকাইত যেমন গৃহের জিনিসপত্র উলটপালট করিয়া রাখিয়া যায়, কৃষ্ণের অঙ্গগন্ধও রমণীদের নাসিকায় প্রবেশ করিয়া তাঁহাদের নাসিকাকে অন্য সকল দিক্ হইতে ঘুরাইয়া কেবল নিজের দিকেই ফিরাইয়া রাখে—অন্য কোনও গন্ধকেই আর তাঁহাদের নাসায় প্রবেশ করিতে দেয়না। কেবল কি ইহাই সখি! কেবল ইহাই যদি হইত, তাহা হইলে তো গুরুজনের সাক্ষাতে লজ্জাহানির সম্ভাবনা থাকিতনা; নাসিকায় কৃষ্ণাঙ্গগন্ধ অনুভবের কথা কেহ জানিতে পারিত না। কৃষ্ণাঙ্গ-গন্ধটি রমণীদিগের নিকটে আসে বোধ হয় সেই তনুহীন কন্দর্পটীকে সঙ্গে করিয়া; অঙ্গগন্ধের অন্তরালেই বোধহয় সেই তনুহীন দেবতাটী আত্মগোপন করিয়া থাকে। তখন দুইজনে মিলিয়া নানারূপে কুলবতীদিগকে বিড়ম্বিত করিতে থাকে—গুরুজনের সাক্ষাতে তাঁহাদের কেশবন্ধন, নীবীবন্ধন খসাইয়া দের—তাঁহাদিগকে পাগলিনী করিয়া দেয়, তখন তাঁহাদের হিতাহিতজ্ঞান থাকেনা. অন্য কোনও বিষয়ে অনুসন্ধান থাকেনা—একমাত্র সেই গন্ধের আধার শ্রীকৃষ্ণের নিমিত্তই তাঁহাদের মনে একমাত্র অনুসন্ধান জাগাইয়া দেয়—তখন তাঁহারা পাগলিনীর ন্যায় ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া গিয়া শ্রীকৃষ্ণের চরণেই দেহ মন প্রাণ অর্পণ করিবার নিমিত্ত উৎকণ্ঠিত হইয়া পড়েন। এইরূপ অদ্ভুত এই অদ্ভুত ডাকাইতের আচরণ।"

৯১। **সেই গন্ধের**—শ্রীকৃষ্ণের সেই অঙ্গগন্ধের। **বশ**—বশীভূত। **পিয়া**—পান করিয়া। **পিঙো**—পান করিব। **তভু**—পেট ভরিয়া পান করিয়াও। কৃষ্ণপ্রেমের একটী বিশেষত্ব এই যে, অভীষ্ট বস্তুকে পাইলেও পাওয়ার পিপাসা মিটে না, বরং এই পিপাসা উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতে থাকে। "তৃষ্ণা শান্তি নহে, তৃষ্ণা বাঢ়ে নিরন্তর। ১।৪।১৩০॥"

"শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গগন্ধ বোধ হয় কোনও মোহিনী-বিদ্যা জানে—তাই রমণীদিগের নাসিকাকে সম্যক্‌রূপে বশীভূত করিয়া ফেলে; এজন্যই বোধ হয় তাঁহাদের নাসিকা সর্ব্বদাই ঐ অপরূপ গন্ধ আস্বাদন করিবার নিমিত্ত উৎকণ্ঠিত;

মদনমোহনের নাট, পসারি গন্ধের হাট,
জগন্নারী গ্রাহক লোভায়।
বিনিমূল্যে দেয় গন্ধ, গন্ধ দিয়া করে অন্ধ,
ঘর যাইতে পথ নাহি পায়॥ ৯২

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

কিন্তু উৎকণ্ঠিত হইলেও নাসিকা সকল সময়ে ইচ্ছামাত্রেই সেই গন্ধ পায় না—কখনও পায়, আবার কখনও পায় না। যখন পায়, তখন নিরবচ্ছিন্ন ভাবে যথেষ্ট পরিমাণেই তাহা আস্বাদন করে; কিন্তু কি আশ্চর্য্য! যথেষ্ট পরিমাণে আস্বাদন করিয়াও তাহার আস্বাদনের আকাঙ্ক্ষা মিটে না—বরং যেন ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইতেই থাকে, তাই সর্ব্বদাই কেবল—"পিঙো পিঙো" রব তার মুখে! গন্ধ পাইলেও নাসিকার তৃষ্ণার শান্তি নাই; কিন্তু যদি না পায়, তখন তো নাসা যেন তৃষ্ণায় বুক ফাটিয়াই মরিয়া যায়—তখনকার প্রাণান্তক কষ্ট-অবর্ণনীয় সখি!"

৯২। এক্ষণে শ্লোকস্থ "স মে মদনমোহনঃ" ইত্যাদি শেষ চরণের অর্থ করিতেছেন।

মদনমোহন—রূপ-গুণাদির অনির্ব্বচনীয়-শক্তিতে স্বয়ং মদনকে পর্য্যন্ত মোহিত করেন যিনি, তিনি মদনমোহন শ্রীকৃষ্ণ। **নাট**—নৃত্য, চাতুর্য্য, কৌশল। রমণীদিগকে ফাঁদে ফেলিবার কৌশল। **পসারি**—প্রসারিত করিয়া, বিস্তৃত করিয়া। **গন্ধের হাট**—যে হাটে (বাজারে) গন্ধ বিক্রয় হয়। **জগন্নারী গ্রাহক**—জগতের রমণীসমূহরূপ-গ্রাহক। **লোভায়**—প্রলুব্ধ করে।

"মদনমোহনের নাট" ইত্যাদি ত্রিপদীর অন্বয়—মদনমোহনের নাট গন্ধের হাট প্রসারিত করিয়া জগন্নারীরূপ গ্রাহকগণকে প্রলুব্ধ করে।

"মদনমোহন শ্রীকৃষ্ণ নারী-ধরার এক কৌশল করিয়াছেন; তিনি একটা হাট বসাইয়াছেন, সেই হাটে তাঁহার অঙ্গগন্ধ বিক্রয় হয়; সেই গন্ধের প্রলোভন দেখাইয়া, জগতে যত রমণী আছেন, সকলকেই তিনি আকর্ষণ করেন—তাঁহারা গন্ধ কিনিবার জন্য গ্রাহকরূপে ঐ হাটে আসেন। যাঁহার রূপে, গুণে, গন্ধে, কৌশলে স্বয়ং মদন পর্য্যন্ত মোহিত হইয়া যায়, সেই মদনমোহন শ্রীকৃষ্ণ নিজেই বিক্রেতা। একে তো সেই গন্ধের লোভ, তাতে আবার দোকানদারের অসমোর্দ্ধমাধুর্য্যময় রূপদর্শনের লোভ; তার উপর আবার, ঐ গন্ধ সাধারণের নিকটে বিক্রয় করিবার জন্য দোকানদার তাহা প্রকাশ্য বাজারে উপস্থিত করিয়া সকলকে আহ্বান করিতেছেন!! এই অবস্থায় কোন্ রমণী আর ধৈর্য্য রক্ষা করিতে সমর্থা হইবেন সখি! তাই লজ্জাদি বিসর্জ্জন দিয়া লোভের প্রবল আকর্ষণে রমণীকুল ঐ হাটের দিকে ধাবিত হইতেছেন।"

যদি কেহ বলেন, কুলবতী রমণীগণ ঐ গন্ধের হাটে আসেন কেন? উত্তর—যাঁর গন্ধে স্বয়ং মদন পর্য্যন্ত মোহিত হয়, তাঁর গন্ধের লোভ সংবরণ করার শক্তি সাধারণ রমণীগণের কিরূপে থাকিবে? তাই তাঁহারা লজ্জাদি সমস্ত বিসর্জ্জন দিয়া গন্ধের জন্য হাটে আসিয়া উপস্থিত হন। ইহাই বোধ হয় এই ত্রিপদীতে মদনমোহন-শব্দ-প্রয়োগের সার্থকতা।

হাট-শব্দের তাৎপর্য্য বোধ হয় এই যে, রমণীগণ লজ্জাবশতঃ সাধারণতঃ হাটে আসেন না; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গগন্ধের এমনি লোভনীয়তা যে, তাঁহারা লজ্জাদি বিসর্জ্জন দিয়াও ঐ গন্ধের হাটে আসিয়া উপস্থিত হন। হাট-শব্দে গন্ধের প্রাচুর্য্যও সূচিত হইতেছে।

কোনও কোনও গ্রন্থে "গন্ধের হাট" স্থানে "চান্দের হাট" পাঠ আছে। এস্থলে বোধ হয় গন্ধকেই চন্দ্র বলা হইয়াছে—চন্দ্রের স্নিগ্ধত্ব ও তাপহারিত্বের সঙ্গে কৃষ্ণাঙ্গগন্ধের স্নিগ্ধত্ব ও সন্তাপহারিত্বের সাদৃশ্য আছে বলিয়া।

অথবা, সমস্ত ত্রিপদীর অন্যরূপ অর্থও বোধ হয় হইতে পারে:—মদনমোহনের নাট, পসারি চাঁদের হাট, জগন্নারী গ্রাহক লোভায়।

নাট—নাটমন্দির। **পসারি**—দোকানদার।

এই মত গৌরহরি, গন্ধে কৈল মন চুরি,
ভৃঙ্গপ্রায় ইতি উতি ধায়।
যায় বৃক্ষ-লতা-পাশে, কৃষ্ণ স্ফুরে সেই আশে,
কৃষ্ণ না পায়, গন্ধমাত্র পায়॥ ৯৩

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

মদনমোহন-শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গরূপ নাটমন্দিরে হাট বসিয়াছে; বহুসংখ্যক চন্দ্র তাহাতে দোকান পাতিয়াছে, তাহারা শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গগন্ধ বিক্রয় করে।

কিন্তু দোকানদার-চন্দ্রসমূহ কি? মধ্যলীলার ২১শ পরিচ্ছেদে কামগায়ত্রীর অর্থপ্রসঙ্গে বলা হইয়াছে—শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গে সাড়ে চব্বিশটী চন্দ্র আছে—তাঁহার মুখ একচন্দ্র, দুই গণ্ড দুই চন্দ্র, ললাট অর্দ্ধচন্দ্র, ললাটস্থ চন্দনবিন্দু এক চন্দ্র, দশটী কর-নখ দশচন্দ্র এবং দশটী পদনখ দশচন্দ্র—এই সাড়ে চব্বিশ চন্দ্র। এই সমস্ত চন্দ্রগণই গন্ধের দোকান পাতিয়া বসিয়াছে—শ্রীকৃষ্ণের দেহরূপ নাটমন্দিরে। ভাবার্থ এই যে, শ্রীকৃষ্ণের মুখ, গণ্ড, ললাট, নখ—প্রত্যেকের গন্ধই পরম লোভনীয়।

নাটমন্দির সাধারণতঃই চিত্তাকর্ষকরূপে সুসজ্জিত থাকে; শ্রীকৃষ্ণের দেহের চিত্তাকর্ষকতা অতুলনীয়, তাহাতে স্বয়ং মদন পর্য্যন্ত মুগ্ধ হয়। এইরূপ পরম-রমণীয় দেহকে গন্ধের হাট (বাজারের স্থান) বলাতে, কেবল মাত্র হাটেরই পরম-লোভনীয়তা সূচিত হইতেছে। তারপর দোকানদার-চন্দ্রগণের প্রত্যেকের লোভনীয়তাও অতুলনীয়; সকলের সমবেত লোভনীয়তার কথা তো দূরে। সর্ব্বোপরি কৃষ্ণাঙ্গ-গন্ধের লোভনীয়তা। এতগুলি লোভনীয় বস্তু যেখানে, সেখানে যাওয়ার লোভ কোনও রমণীই সম্বরণ করিতে সমর্থা নহেন—তাই লজ্জাদি বিসর্জ্জন দিয়া সকলে ঐ হাটের দিকে ধাবিত হন।

রমণীদিগের লোভের আরও একটী হেতু বলিতেছেন—গন্ধ বিনামূল্যে বিক্রয় হয়; যে হাটে যায়, তাহাকেই দেওয়া হয়; কোনওরূপ মূল্য দেওয়ার প্রয়োজন হয় না; একবার হাটে যাইতে পারিলেই হয়।

কোনও বস্তুর নিমিত্ত লোভ জন্মিলেও হাতে যদি পয়সা না থাকে, তাহা হইলে কেহ বাজারে যাইতে ইচ্ছা করে না; কারণ, বাজারে গেলেও লোভনীয় বস্তুটী কিনিতে পারিবে না। কিন্তু যখন জানা যায় যে, কোনও মূল্যই লাগিবে না, একবার হাটে যাইতে পারিলেই বস্তুটী পাওয়া যাইবে, তখন হাটে যাওয়ার লোভ কেহই সম্বরণ করিতে পারে না।

গন্ধ দিয়া করে অন্ধ—পূর্ব্ববর্ত্তী ৮৬ ত্রিপদীর টীকা দ্রষ্টব্য।

ঘর যাইতে পথ নাহি পায়—চক্ষু অন্ধপ্রায় হইয়া যায় বলিয়া পথ দেখিতে পায় না।

ঐ হাটে গেলেই বিনামূল্যে গন্ধ পাওয়া যায়। রমণীগণ এইরূপে যখন শ্রীকৃষ্ণাঙ্গগন্ধ পায়, তখন ঐ গন্ধের প্রভাবে তাঁহাদের চক্ষুরাদি সমস্ত ইন্দ্রিয়বৃত্তির ক্রিয়াই লুপ্ত হইয়া যায়, তাঁহারা যেন উন্মত্তের ন্যায় হইয়া পড়েন; গৃহের কথা, আত্মীয়স্বজনের কথা, কুলধর্ম্মাদির কথা—কোনও বিষয়েই আর তখন তাঁহাদের কোনওরূপ অনুসন্ধান থাকে না।

৯৩। এইমত ইত্যাদি; **অন্বয়**—এইমত, (কৃষ্ণের অঙ্গ) গন্ধে (প্রভুর) মন চুরি করিল; (তখন) গৌরহরি ভৃঙ্গপ্রায় ইতিউতি ধাইতে লাগিলেন।

ভৃঙ্গ—ভ্রমর। **ভৃঙ্গপ্রায়**—ভ্রমরের মত। **ইতিউতি**—এদিক্ ওদিক্; ইতস্ততঃ। **ভৃঙ্গপ্রায় ইতিউতি ধায়**—অশোকের তলে শ্রীকৃষ্ণ-দর্শনের সময় হইতেই প্রভু শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গগন্ধ পাইতেছিলেন; সেই গন্ধে মাতোয়ারা হইয়া তিনি দিগ্‌বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হইয়াছিলেন। ফুলের গন্ধে আকৃষ্ট হইয়া ভ্রমর যেমন ফুলের অন্বেষণে ইতস্ততঃ ঘুরিয়া বেড়ায়, শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গগন্ধে আকৃষ্টচিত্ত রাধাভাবাবিষ্ট প্রভুও তেমনি গন্ধের উৎস শ্রীকৃষ্ণের অন্বেষণে দ্রুতবেগে ইতস্ততঃ ছুটাছুটি করিতে লাগিলেন।

স্বরূপ রামানন্দ গায়, প্রভু নাচে সুখ পায়,
এই মতে প্রাতঃকাল হৈল।
স্বরূপ রামানন্দ রায়, করি নানা উপায়,
মহাপ্রভুর বাহ্যস্ফূর্ত্তি কৈল ॥ ৯৪

মাতৃভক্তি প্রলপন, ভিত্ত্যে মুখসংঘর্ষণ,
কৃষ্ণগন্ধস্ফূর্ত্ত্যে দিব্য নৃত্য।
এই চারি লীলাভেদে, গাইল এই পরিচ্ছেদে,
কৃষ্ণদাস রূপগোসাঞির ভৃত্য ॥ ৯৫

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

ভৃঙ্গের সঙ্গে প্রভুর তুলনা দেওয়ার আরও সার্থকতা বোধ হয় এই যে, উড়িয়া যাইবার সময় ভ্রমর যেমন গুন্ গুন্ শব্দ করে, ছুটাছুটি করিবার সময়েই বোধ হয় প্রভুও উপরোক্ত প্রলাপ-বাক্য-সমূহ বলিয়াছিলেন।

বৃক্ষ-লতা-পাশে—উদ্যানস্থিত বৃক্ষ-লতার নিকটে।

কৃষ্ণ স্ফুরে সেই আশে—সেখানে হয় তো কৃষ্ণকে দেখিতে পাইবেন এই আশায়।

প্রভু কৃষ্ণাঙ্গগন্ধে উন্মত্তের ন্যায় হইয়া উদ্যানের বৃক্ষ-লতার নিকটে ছুটিয়া যান—মনে করেন, সেখানে গেলেই কৃষ্ণকে দেখিতে পাইবেন। কিন্তু সেখানে গিয়াও কৃষ্ণকে দেখিতে পান না—কেবল কৃষ্ণের **অঙ্গগন্ধ** মাত্র অনুভব করেন।

কৃষ্ণপ্রাপ্তির আশায় বৃক্ষ-লতার নিকটে যাওয়া উদ্‌ঘূর্ণার লক্ষণ।

৯৪। **স্বরূপ রামানন্দ গায়**—স্বরূপ-দামোদর ও রায়রামানন্দ প্রভুর ভাবানুকূল ললিত-লবঙ্গ-লতাদি পদ-কীর্ত্তন করেন।

প্রভু নাচে সুখ পায়—স্বরূপ-রামানন্দের গীত শুনিতে শুনিতে গীতের ভাবে আবিষ্ট হইয়া প্রভু নৃত্য করেন এবং নৃত্যকালে শ্রীকৃষ্ণসঙ্গ অনুভব করিয়া অন্তরে সুখও পান।

এই মত ইত্যাদি—স্বরূপাদির গীত ও প্রভুর নৃত্যাদিতে সমস্ত রাত্রি অতিবাহিত হইয়া প্রাতঃকাল উপস্থিত হইল।

প্রাতঃকাল উপস্থিত দেখিয়া স্বরূপ-দামোদর ও রায়রামানন্দ নানা উপায়ে প্রভুকে বাহ্যদশায় আনয়ন করিলেন।

"স্বরূপ রামানন্দ রায়" স্থলে "স্বরূপ রামানন্দ গায়" পাঠও আছে। অর্থ—স্বরূপ রামানন্দ কীর্ত্তনাদি করিয়া নানা উপায়ে প্রভুর বাহ্যস্ফূর্ত্তি করাইলেন।

৯৫। এই পরিচ্ছেদে, প্রভুর মাতৃভক্তি-প্রকটন, দিব্যোন্মাদে প্রলাপবাক্য, গম্ভীরার ভিত্তিতে মুখ-ঘর্ষণ এবং শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গগন্ধ-স্ফূর্ত্তিতে প্রভুর দিব্য নৃত্য—এই চারিটী লীলা বর্ণিত হইয়াছে—ইহাই এই ত্রিপদীতে গ্রন্থকার কবিরাজগোস্বামী জানাইতেছেন।

মাতৃভক্তি—প্রভুর মাতৃভক্তি। নানাবিধ সংবাদাদি লইয়া জগদানন্দ পণ্ডিতকে নদীয়ায় প্রেরণ ব্যাপার। **প্রলপন**—দিব্যোন্মাদ-জনিত প্রলাপ। **ভিত্ত্যে মুখ-সংঘর্ষণ**—শ্রীকৃষ্ণবিরহ-স্ফূর্ত্তিতে উদ্বেগ বশতঃ গম্ভীরা হইতে বাহির হওয়ার চেষ্টায় দেওয়ালে মুখ-ঘর্ষণ। **এই চারিলীলা ভেদ**—মাতৃভক্তি, প্রলপন, মুখ-সংঘর্ষণ ও দিব্যনৃত্য এই চারিটী লীলা। **কৃষ্ণদাস**—গ্রন্থকার কৃষ্ণদাসকবিরাজ-গোস্বামী। **রূপগোসাঞির ভৃত্য**—রসতত্ত্বাদি-বিষয়ে শ্রীরূপ গোস্বামিচরণ গ্রন্থকার কবিরাজ গোস্বামীর শিক্ষাগুরু; তাই তাঁহার ভৃত্য বলিয়া নিজের পরিচয় দিতেছেন।

কবিরাজ গোস্বামীর মন্ত্রগুরু-প্রসঙ্গ। জনৈক বৈষ্ণব ভক্ত বলেন, এই ত্রিপদীর অন্তর্গত "কৃষ্ণদাস রূপগোসাঞির ভৃত্য"-বাক্যে গোস্বামী জানাইতেছেন যে, শ্রীপাদ রূপগোস্বামীই তাঁহার মন্ত্রদাতা দীক্ষা গুরু। তাঁহার উক্তির সমর্থনে তিনি বলিলেন, (ক) শ্রীশ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতের সারঙ্গরঙ্গদা টীকার উপসংহারেও কবিরাজগোস্বামী লিখিয়াছেন—"শ্রীরূপ চরণাব্জালি-কৃষ্ণদাসেন বর্ণিতা। কৃষ্ণকর্ণামৃতস্যৈষা টীকা সারঙ্গরঙ্গদা॥—শ্রীরূপগোস্বামীর

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

চরণপদ্মের ভৃঙ্গ কৃষ্ণদাস-কর্তৃক কৃষ্ণকর্ণামৃতের সারঙ্গরঙ্গদানাম্নী এই টীকা বর্ণিত হইল।" এবং (খ) শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের আদিলীলার প্রথম পরিচ্ছেদে কবিরাজগোস্বামী লিখিয়াছেন—"মন্ত্রগুরু আর যত শিক্ষাগুরুগণ। তাঁহার চরণ আগে করিয়ে বন্দন ॥ ১৭ ॥ শ্রীরূপ, সনাতন, ভট্টরঘুনাথ। শ্রীজীব, গোপালভট্ট, দাস রঘুনাথ ॥ ১৮ ॥ এই ছয় গুরু—শিক্ষাগুরু যে আমার। তাঁসভার পাদপদ্মে কোটি নমস্কার ॥ ১৯ ॥" তিনি বলেন—১৭শ পয়ারে কবিরাজ প্রতিজ্ঞা (প্রস্তাব) করিতেছেন, তিনি তাঁহার মন্ত্রগুরু ও শিক্ষাগুরুগণের কথা বলিবেন। তার পরেই ১৮শ এবং ১৯শ পয়ারে শিক্ষাগুরুরূপে যে ছয় জনের নাম বলিলেন, তাঁহাদের মধ্যে সর্ব্বাগ্রেই শ্রীরূপের নাম বলিয়াছেন। মন্ত্রগুরু এবং শিক্ষা-গুরুগণের কথা বলার প্রস্তাব করিয়া মন্ত্রগুরুর কথা কিছু বলিয়াই শিক্ষাগুরুগণের কথা বলিবেন, ইহাই স্বাভাবিক। প্রথমে মন্ত্রগুরুর কথাই বলিবেন। সুতরাং সর্ব্বপ্রথমে তিনি যখন শ্রীরূপগোস্বামীর নামই উল্লেখ করিয়াছেন, তাহাতেই বুঝা যায়, শ্রীপাদ রূপগোস্বামীই তাঁহার দীক্ষাগুরু।

উল্লিখিত যুক্তির উত্তরে যাহা বলা যায়, তাহা এই:—(১) শ্রীপাদ কবিরাজগোস্বামী নিজেকে শ্রীপাদ রূপগোস্বামীর ভৃত্য বলিয়া পরিচয় দেওয়াতে শ্রীপাদরূপকে তাঁহার প্রভু বলিয়াই পরিচয় দিলেন। ইহাতেই যদি শ্রীপাদরূপকে তাঁহার দীক্ষাগুরু বলিয়া মনে করিতে হয়, তাহা হইলে তাঁহারই অনুরূপ উক্তি অনুসারে শ্রীলরঘুনাথ দাস গোস্বামীকেও তাঁহার দীক্ষাগুরু বলা চলে; যেহেতু কবিরাজ নিজেই লিখিয়াছেন—"সেই রঘুনাথদাস প্রভু যে আমার ॥ ১।১০।১০১ ॥"—তিনি আরও লিখিয়াছেন—"নিত্যানন্দরায় প্রভুর স্বরূপ প্রকাশ। তাঁর পাদপদ্ম বন্দো যাঁর মুঞি দাস ॥ ১।১।২২॥" এই পয়ারোক্তি অনুসারে শ্রীমন্নিত্যানন্দকেও কবিরাজগোস্বামীর দীক্ষাগুরু বলা চলে। "দাস" এবং "প্রভু" শব্দদ্বারাই যদি দীক্ষাগুরু নির্ণয় করিতে হয়, তাহা হইলে উদ্ধৃত উক্তিগুলি হইতে মনে করিতে হয়—শ্রীমন্নিত্যানন্দ, শ্রীপাদরূপ এবং শ্রীপাদ রঘুনাথ দাসগোস্বামী—ইঁহাদের প্রত্যেকেই কবিরাজ-গোস্বামীর মন্ত্রগুরু; কিন্তু দীক্ষাগুরু একাধিক হয় না। সুতরাং "কৃষ্ণদাস রূপগোসাঞির ভৃত্য"—কেবল এই উক্তিদ্বারাই স্থির সিদ্ধান্তে আসা যায় না যে, কবিরাজগোস্বামী শ্রীপাদ রূপগোস্বামীর মন্ত্রশিষ্য।

(২) শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতের টীকার উপসংহার-বাক্য হইতেও স্থির-সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় বলিয়া মনে হয় না। শ্রীপাদ রূপগোস্বামী, কবিরাজ-গোস্বামীর একতম শিক্ষাগুরু। রসতত্ত্বাদি-বিষয়ে শ্রীপাদরূপ "যোগ্যপাত্র" ছিলেন বলিয়া রস-শাস্ত্র প্রচারের উপযোগিনী শক্তিও যে মহাপ্রভু তাঁহাতে সঞ্চারিত করিয়াছিলেন—একথা স্বয়ং মহাপ্রভুই বলিয়া গিয়াছেন (৩।১।৮০)। শ্রীপাদরূপের নিকটে এবং শ্রীপাদরূপের কৃপায় কবিরাজগোস্বামী রস-বিষয়ে যাহা শিক্ষা করিয়াছিলেন (১।৫।১৮১), তাহার উপর ভিত্তি করিয়াই তিনি কর্ণামৃতের টীকা "সারঙ্গ-রঙ্গদা" লিখিয়াছেন। শ্রীল রূপগোস্বামীর চরণরূপ পদ্ম হইতে ভ্রমররূপে তিনি যে মধু আহরণ করিয়াছেন, তাহাই তিনি তাঁহার সারঙ্গরঙ্গদা টীকায় বিতরণ করিয়াছেন—"শ্রীরূপচরণাব্জালি কৃষ্ণদাসেন বর্ণিতা। সারঙ্গরঙ্গদা ॥"-বাক্যের তাৎপর্য্য এইরূপও হইতে পারে। সুতরাং এই বাক্যের দ্বারাও সিদ্ধান্ত করা যায় না যে—তিনি শ্রীপাদরূপের মন্ত্রশিষ্য।

(৩) উপরে শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের আদিলীলা প্রথম পরিচ্ছেদ হইতে যে কয়টী পয়ার উদ্ধৃত হইয়াছে, আলোচনার সুবিধার নিমিত্ত এস্থলে তৎ-সংশ্লিষ্ট সব কয়টী পয়ারই উদ্ধৃত হইতেছে। "কৃষ্ণ, গুরু, ভক্ত, শক্তি, অবতার, প্রকাশ। কৃষ্ণ এই ছয়রূপে করেন বিলাস ॥ ১৫॥ এই ছয় তত্ত্বের করি চরণ বন্দন। প্রথমে সামান্যে করি মঙ্গলাচরণ ॥ ১৬॥ তথাহি—বন্দে গুরূনীশভক্তানীশমীশাবতারকান্। তৎ প্রকাশাংশ্চ তচ্ছক্তীঃ কৃষ্ণচৈতন্য-সংজ্ঞকম্। মন্ত্রগুরু আর যত শিক্ষাগুরুগণ। তাঁহার চরণ আগে করিয়ে বন্দন ॥ ১৭॥ শ্রীরূপ, সনাতন, ভট্ট-রঘুনাথ। শ্রীজীব, গোপাল ভট্ট, দাস রঘুনাথ ॥ ১৮॥ এই ছয় গুরু শিক্ষাগুরু যে আমার। তাঁসভার পাদপদ্মে কোটি নমস্কার ॥ ১৯॥ ভগবানের ভক্ত যত শ্রীবাস প্রধান। তাঁসভার পাদপদ্মে সহস্র প্রণাম ॥ ২০॥ অদ্বৈত আচার্য্য প্রভুর অংশ অবতার। তাঁর পাদপদ্মে কোটি প্রণতি আমার ॥ ২১ ॥ নিত্যানন্দ রায় প্রভুর স্বরূপ প্রকাশ।

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

তাঁর পাদপদ্ম বন্দো যাঁর মুঞি দাস ॥ ২২ ॥ গদাধর পণ্ডিতাদি প্রভুর নিজ শক্তি। তাঁসভার চরণে মোর সহস্র প্রণতি ॥ ২৩ ॥ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু স্বয়ং ভগবান্। তাঁহার পদারবিন্দে অনন্ত প্রণাম ॥ ২৪ ॥ সাবরণে প্রভুরে করিয়া নমস্কার। এই ছয় তেঁহো যৈছে—করি সে বিচার ॥ ২৫ ॥"

এই কয় পয়ার হইতে স্পষ্টই বুঝা যায়, "কৃষ্ণ, গুরু, ভক্ত, শক্তি" ইত্যাদি পয়ারেই কবিরাজগোস্বামীর মূল প্রতিজ্ঞা বা প্রতিপাদ্য বিষয়ের কথা বলা হইয়াছে। সর্ব্বশেষ "সাবরণে প্রভুরে" ইত্যাদি পয়ার হইতেও তাহা বুঝা যাইতেছে। "কৃষ্ণ, গুরু" ইত্যাদি ছয় বস্তু রূপে কিরূপে শ্রীকৃষ্ণ বা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য বিহার করেন, তাহা প্রতিপন্ন করাই কবিরাজগোস্বামীর উদ্দেশ্য—ইহাই মূল প্রতিজ্ঞা। তাহা প্রতিপাদন করিতে আরম্ভ করার পূর্ব্বে তিনি বলিয়াছেন—"এই ছয় তত্ত্বের করি চরণ-বন্দন। প্রথমে সামান্যে করি মঙ্গলাচরণ ॥ ১।১।১৬ ॥" ইহা বলিয়াই "বন্দে গুরূনিত্যাদি" শ্লোকটী বলিলেন; এই শ্লোকের মধ্যে এই ছয় তত্ত্বের উল্লেখ ও এই ছয় তত্ত্বের উদ্দেশ্যে নমস্কার আছে। এই শ্লোকের উল্লেখেই ছয় তত্ত্বের চরণ বন্দনা করা হইল। শ্লোকের পরবর্ত্তী আট (১৭-২৪) পয়ারে শ্লোকেরই অনুবাদ দেওয়া হইয়াছে; অনুবাদের মধ্যে কে কোন্ তত্ত্ব, তাহারও উল্লেখ করা হইয়াছে। "মন্ত্রগুরু আর যত শিক্ষাগুরুগণ। তাঁহার চরণ আগে করিয়ে বন্দন ॥ ১।১।১৭ ॥"—এই পয়ারটী প্রতিজ্ঞা-বাক্য নহে; ইহা হইতেছে শ্লোকস্থ "গুরূন্ বন্দে" বাক্যের অনুবাদ। শ্লোকের "গুরূন্"-শব্দটী বহুবচনান্ত, গুরুগণ। "গুরূন্—গুরুগণ"-শব্দে কাহাকে কাহাকে লক্ষ্য করা হইয়াছে, অনুবাদে তাহাই তিনি খুলিয়া বলিয়াছেন—"মন্ত্রগুরু আর যত শিক্ষাগুরুগণ।" তার পরে শ্রীরূপাদি ছয় গোস্বামীর নাম উল্লেখ করিয়া বলিলেন—এই ছয়জন তাঁহার শিক্ষাগুরু। দীক্ষাগুরুর নাম উল্লেখ করিলেন না; অথচ এই ছয় গোস্বামীই যে তাঁহার শ্লোকের "গুরূন্"-শব্দের লক্ষ্য—"মন্ত্রগুরু আর যত শিক্ষাগুরুগণ" যে এই ছয় গোস্বামীর নামের দ্বারাই প্রকাশ করিলেন, তাহা স্বীকার না করিয়া উপায় নাই। এই ছয় জনের এক জনকে কেবলমাত্র "দীক্ষাগুরু" মনে করিলে শিক্ষাগুরু হইয়া পড়েন পাঁচজন; অথচ তিনি বলিয়াছেন, তাঁহার শিক্ষাগুরু ছয়জন। ইহার সমাধান এই যে—এই ছয় শিক্ষাগুরুর মধ্যেই একজন তাঁহার দীক্ষাগুরুও। কিন্তু তিনি কে, কবিরাজ এস্থলে তাহা বলেন নাই। শ্রীরূপের নাম সর্ব্বপ্রথমে উল্লিখিত হইয়াছে বলিয়াই শ্রীরূপকে তাঁহার মন্ত্রগুরু বলিয়া মনে করা সমীচীন হইবে বলিয়া মনে হয় না। যেহেতু, বৈষ্ণবাচার্য্য-শ্রেষ্ঠ বলিয়া প্রায় সর্ব্বত্রই শ্রীশ্রীরূপ-সনাতনের নাম সর্ব্বাগ্রে লিখিত হয়।

উল্লিখিত ভক্ত বৈষ্ণব-মহোদয় যাহা বলিয়াছেন, তাঁহার কথিত প্রমাণগুলি হইতে তাহা তিনি অনুমানমাত্রই করিয়াছেন। প্রত্যক্ষ প্রমাণ কিছু দেখাইতে পারেন নাই। প্রত্যক্ষ প্রমাণের অভাবে কেবল অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া কোনও স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সঙ্গত বলিয়া মনে হয় না। বিশেষতঃ, শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে শ্রীল কবিরাজগোস্বামীর দুইটী উক্তি হইতেই জানা যায়—শ্রীরঘুনাথ তাঁহার দীক্ষাগুরু, শ্রীরূপ নহেন। উক্তি দুইটী এই:—"শ্রীস্বরূপ শ্রীরূপ শ্রীসনাতন। শ্রীরঘুনাথ শ্রীগুরু শ্রীজীবচরণ ॥ ৩।২০।৮৮ ॥ শ্রীস্বরূপ শ্রীরূপ শ্রীসনাতন। শ্রীগুরু শ্রীরঘুনাথ শ্রীজীবচরণ ॥ ৩।২০।১৩৬ ॥" প্রথম পয়ারের "শ্রীগুরু" কি শ্রীরঘুনাথের বিশেষণ, না কি শ্রীজীবের বিশেষণ, তাহা হয়তো নিশ্চিতরূপে স্থির করা যায় না; কিন্তু দ্বিতীয় পয়ারে "শ্রীগুরু" শব্দ "শ্রীরঘুনাথের" পূর্ব্বে লিখিত হওয়ায় সন্দেহের আর অবকাশ থাকে না। "গুরু"-শব্দে সাধারণতঃ দীক্ষাগুরুকেই বুঝায়।

কিন্তু কোন্ রঘুনাথ শ্রীল কবিরাজের দীক্ষাগুরু? রঘুনাথ ভট্ট? না কি রঘুনাথ দাস?

কবিরাজ পরিবারের ভক্তদের অনেকগুলি গুরুপ্রণালিকা দেখিবার সুযোগ আমাদের হইয়াছে। ঐসমস্ত গুরুপ্রণালিকা হইতে জানা যায়—শ্রীরূপগোস্বামীর শিষ্য শ্রীরঘুনাথ ভট্টগোস্বামী, তাঁহার শিষ্য শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী, তাঁহার শিষ্য শ্রীমুকুন্দদাস-গোস্বামী, তাঁহার শিষ্য শ্রীরূপ কবিরাজ-গোস্বামী। ইহার পরে ভিন্ন ভিন্ন

এই মতে মহাপ্রভু পাইয়া চেতন।
স্নান করি কৈল জগন্নাথ দরশন ॥ ৯৬
অলৌকিক কৃষ্ণলীলা—দিব্য শক্তি তার।
তর্কের গোচর নহে চরিত্র যাঁহার ॥ ৯৭
এই প্রেমা সদা জাগে যাহার অন্তরে।
পণ্ডিতেহো তার চেষ্টা বুঝিতে না পারে ॥ ৯৮

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ (১।৪।১২)—
ধন্যস্যায়ং নবপ্রেমা যস্যোন্মীলতি চেতসি।
অন্তর্ব্বাণীভিরপ্যস্য মুদ্রা সুষ্ঠু সুদুর্গমা ॥ ৭

অলৌকিক প্রভুর চেষ্টা প্রলাপ শুনিয়া।
তর্ক না করিহ, শুন বিশ্বাস করিয়া ॥ ৯৯

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

গুরুপ্রণালিকাতে ভিন্ন ভিন্ন নাম দৃষ্ট হয়। এই গুরুপ্রণালিকা হইতে জানা গেল—শ্রীল রঘুনাথ ভট্টগোস্বামীই শ্রীল কবিরাজ গোস্বামীর দীক্ষাগুরু। এই গুরুপ্রণালিকাকে অবিশ্বাস করিবার কোনও হেতু দেখা যায় না। উক্ত ভক্ত বৈষ্ণব মহোদয়ও উহার কৃত্রিমতাসম্বন্ধে কোনও প্রমাণের উল্লেখ করিতে পারেন নাই।

আবার কবিরাজ গোস্বামীর নিজের রচিত "শ্রীমদ্‌রঘুনাথ-ভট্টগোস্বাম্যষ্টকম্"-নামক অষ্টকে তিনি স্পষ্ট কথাতেই বলিয়া গিয়াছেন যে, শ্রীল রঘুনাথ ভট্টগোস্বামীই তাঁহার দীক্ষাগুরু; এবং তাঁহাকে স্বচরণে আশ্রয় দিয়া শ্রীল ভট্টগোস্বামী যে তৎক্ষণাৎই তাঁহাকে শ্রীল রূপগোস্বামীর চরণে অর্পণ করিয়াছেন, শ্রীল কবিরাজ তাহাও ঐ অষ্টকে লিখিয়াছেন। "মহ্যং স্বপদাশ্রয়ং করুণয়া দত্ত্বা পুনস্তৎক্ষণাৎ শ্রীমদ্রূপপদারবিন্দমতুলং মামর্পিতঃ স্বাশ্রয়াৎ। নিত্যানন্দ-কৃপাবলেন যমহং প্রাপ্য প্রকৃষ্টোঽভবং তং শ্রীমদ্‌রঘুনাথভট্টমনিশং প্রেম্না ভজে সাগ্রহম্ ॥ যঃ কোঽপি প্রপঠেদিদং মম গুরোঃ প্রীত্যাষ্টকং প্রত্যহং শ্রীরূপঃ স্বপদারবিন্দমতুলং দত্ত্বা পুনস্তৎক্ষণাৎ। তস্মৈ শ্রীব্রজকাননে ব্রজযুবদ্বন্দস্য সেবামৃতং সম্যগ্ যচ্ছতি সাগ্রহং প্রিয়তরং নাস্তদ্ যতো ভো নমঃ ॥" শ্রীল রূপগোস্বামী হইলেন শ্রীল কবিরাজের পরম-গুরু; তাঁহার গুরুদেব কৃপা করিয়া তাঁহাকে তাঁহার পরম-গুরুর চরণেই অর্পণ করিয়াছেন। ইহা হইতেই নিঃসন্দিগ্ধ ভাবে বুঝা যায়—কবিরাজ কেন বলিয়াছেন "কৃষ্ণদাস রূপগোসাঞির ভৃত্য" এবং "শ্রীরূপচরণাব্জালি-কৃষ্ণদাসেন।"

এই অষ্টকের কৃত্রিমতা সম্বন্ধে কোনও প্রমাণও উক্ত ভক্ত বৈষ্ণব-মহোদয় উল্লেখ করিতে পারেন নাই। যতক্ষণ পর্য্যন্ত এই অষ্টক বা কবিরাজ-পরিবারের গুরুপ্রণালিকা কৃত্রিম বলিয়া নিঃসন্দেহভাবে প্রমাণিত না হয়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত শ্রীল রঘুনাথ ভট্ট গোস্বামীকেই শ্রীল কবিরাজ-গোস্বামীর দীক্ষাগুরু বলিয়া মানিয়া লওয়া সঙ্গত মনে হয়। শ্রীরূপগোস্বামী যে তাঁহার দীক্ষাগুরু নহেন, পূর্ব্বোদ্ধৃত শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের উক্তিই তাহার প্রমাণ।

৯৭। **দিব্যশক্তি**—অচিন্ত্যশক্তি।

তর্কের গোচর নহে ইত্যাদি—শ্রীকৃষ্ণলীলা অপ্রাকৃত চিন্ময়ী লীলা; ইহা অচিন্ত্যশক্তিসম্পন্না। এজন্য ইহা মানুষের সাধারণ যুক্তিতর্কের বিষয়ীভূত হইতে পারে না! "অচিন্ত্যাঃ খলু যে ভাবাঃ ন তাংস্তর্কেন যোজয়েৎ।"

৯৮। **পণ্ডিতেহো** ইত্যাদি—কেবল পাণ্ডিত্যের বলে কেহই কৃষ্ণপ্রেমিকের আচরণ বুঝিতে সমর্থ নহে।

শ্লো। ৭। অন্বয়। অন্বয়াদি ২।২৩।১৯ শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

৯৮-পয়ারোক্তির প্রমাণ এই শ্লোক।

৯৯। মহাপ্রভুর প্রলাপে যাহা বর্ণিত হইয়াছে, বা যে সকল ভাব প্রকটিত হইয়াছে, কিম্বা মহাপ্রভুর আচরণ সম্বন্ধে যাহা বলা হইয়াছে—সাধারণ বুদ্ধিতে তাহা অস্বাভাবিক বা অসম্ভব বলিয়া মনে হইতে পারে। কিন্তু বাস্তবিক তাহা অস্বাভাবিক বা অসম্ভব নহে—তবে তাহা অলৌকিক। লৌকিক জগতে যে তথাকথিত প্রেম দেখা যায়, তাহার প্রভাবে এইরূপ হওয়া সম্ভব নহে। কিন্তু অপ্রাকৃত শ্রীকৃষ্ণপ্রেমে উহা স্বাভাবিক; তাহাতে কোনওরূপ সন্দেহের পোষণ করিবে না—এসমস্ত ধ্রুবসত্য, ইহাই বিশ্বাস করিবে।

ইহার সত্যত্বে প্রমাণ—শ্রীভাগবতে।
শ্রীরাধার প্রেম-প্রলাপ ভ্রমর-গীতাতে ॥ ১০০
মহিষীর গীত যেন দশমের শেষে।
পণ্ডিতে না বুঝে তার অর্থ সবিশেষে ॥ ১০১
মহাপ্রভু নিত্যানন্দ দোঁহার দাসের দাস।
যারে কৃপা করে, তার ইহাতে বিশ্বাস ॥ ১০২
শ্রদ্ধা করি শুন, শুনিতে পাইবে মহাসুখ।
খণ্ডিবে আধ্যাত্মিকাদি কুতর্কাদি দুখ ॥ ১০৩
চৈতন্যচরিতামৃত নিত্য নূতন।
শুনিতে শুনিতে জুড়ায় হৃদয়-শ্রবণ ॥ ১০৪
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ১০৫

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অন্ত্যখণ্ডে বিরহ-
প্রলাপমুখসঙ্ঘর্ষণাদিবর্ণনং নাম
ঊনবিংশপরিচ্ছেদঃ ॥ ১৯ ॥

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

১০০। রাধাভাবাবিষ্ট প্রভুর আচরণ এবং প্রলাপ যে সত্য—শ্রীমদ্‌ভাগবতের ভ্রমরগীতায় উল্লিখিত শ্রীরাধার প্রলাপবচনই তাহার প্রমাণ। ভ্রমরগীতায় শ্রীরাধার এইরূপ চেষ্টা ও প্রলাপবচনের উল্লেখ আছে।

ভ্রমরগীতা—শ্রীমদ্‌ভাগবতের ১০ম স্কন্ধের ৪৭শ অধ্যায়ের কয়েকটী শ্লোককে ভ্রমরগীতা বলে। উদ্ধবের আগমনে একটী ভ্রমরকে শ্রীকৃষ্ণদূত মনে করিয়া দিব্যোন্মাদবতী শ্রীরাধা প্রলাপ করিয়াছিলেন; ভ্রমরগীতায় 'মধুপ কিতববন্ধো" ইত্যাদি দশটী শ্লোকে তাহা বর্ণিত হইয়াছে।

১০১। **মহীষীর গীত**—দ্বারকাস্থিত শ্রীকৃষ্ণমহিষীগণ শ্রীকৃষ্ণের সমীপবর্ত্তিনী থাকিয়াও প্রেমবৈচিত্ত্যবশতঃ শ্রীকৃষ্ণের বিরহ-স্ফূর্ত্তিতে যে সকল প্রলাপকীর্ত্তন করিয়াছিলেন, শ্রীমদ্‌ভাগবতের ১০ম স্কন্ধের ৯০ম অধ্যায়ে "কুররি বিলপসি" ইত্যাদি দশটী শ্লোকে তাহাও বর্ণিত হইয়াছে।

দশমের শেষে—শ্রীমদ্‌ভাগবতের ১০ম স্কন্ধের শেষ অধ্যায়ে (৯০ম অধ্যায়ে)।

১০২। উক্ত প্রলাপাদির মর্ম্ম পণ্ডিত লোকও বুঝিতে পারে না; তাই পণ্ডিত লোকেরও তাহাতে বিশ্বাস হয় না; কিন্তু যাঁহার প্রতি শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দের ও তাঁহাদের দাসানুদাসের কৃপা হইয়াছে, তিনিই উহা বুঝিতে পারিবেন, ইহাতে তাঁহার অচল বিশ্বাসও জন্মিবে। স্থূলতঃ, গৌরভক্তের কৃপাব্যতীত এ সকল প্রলাপের মর্ম্ম বুঝা যায় না।

১০৩। **আধ্যাত্মিকাদি দুঃখ**—আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক দুঃখ। **কুতর্কাদি দুঃখ**—শাস্ত্রবিগর্হিত তর্কদ্বারা যে দুঃখ জন্মে।

১০৪। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের অপূর্ব্ব মাহাত্ম্যের কথা বলিতেছেন। ইহা নিত্যই নূতন, যতবারই শুনা যাউক না কেন, কখনও পুনরায় শুনিতে অনিচ্ছা হইবে না; সর্ব্বদাই মনে হইবে, যেন, এইমাত্র ইহা প্রথমবার শুনিতেছি। বাস্তবিক শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-গ্রন্থরূপেই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-মহাপ্রভু বিরাজমান। প্রভুর মাধুর্য্যও যেমন নিত্য নূতন, তাঁহার লীলাকথার মাধুর্য্যও তেমনি নিত্যনূতন।

শ্রীকৃষ্ণবিরহার্ত্তা শ্রীরাধার ভাবে আবিষ্ট শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরে তাঁহার স্বরূপের যে বৈচিত্রী অভিব্যক্তি লাভ করিয়াছে, সে সম্বন্ধে এস্থলে দু'একটী কথা বলা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

প্রেমবিলাসবিবর্ত্ত-মূর্ত্তবিগ্রহ গৌর এবং বিপ্রলম্ভ-মূর্ত্তবিগ্রহ গৌর।

স্বীয় মাধুর্য্যের পূর্ণতম আস্বাদনের—শ্রীকৃষ্ণ-মাধুর্য্য শ্রীরাধা যেভাবে আস্বাদন করেন, ঠিক সেই ভাবে আস্বাদনের—জন্যই ব্রজলীলাতে শ্রীকৃষ্ণের বলবতী এবং ক্রমশঃ বৃদ্ধিশীলা লালসা। মাধুর্য্য-আস্বাদনের একমাত্র উপায় হইল প্রেম—আশ্রয়জাতীয় প্রেম। যাঁহার মধ্যে শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক প্রেমের পূর্ণতম বিকাশ, কেবলমাত্র তিনিই শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্য পূর্ণতমরূপে আস্বাদন করিতে পারেন। প্রেমের পূর্ণতম বিকাশের নাম হইল মাদন—মাদনাখ্য

গৌর কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

মহাভাব; ইহা কেবল শ্রীরাধার মধ্যেই আছে, অপর কাহারও মধ্যেই নাই। শ্রীকৃষ্ণ এই মাদনের কেবলমাত্র বিষয়, আশ্রয় নহেন। তাই, স্বীয় মাধুর্য্য পূর্ণতমরূপে আস্বাদনের বাসনা পরিপূরণের নিমিত্ত শ্রীরাধার মাদনাখ্য মহাভাবের আশ্রয় হওয়ার জন্য তাঁর লালসা। মাদনের আশ্রয় হওয়ার জন্যই তাঁহাকে শ্রীরাধার সহিত নিবিড়তম ভাবে মিলিত হইতে হইয়াছে, শ্রীপাদ স্বরূপদামোদরের কথায় বলিতে গেলে—"তদ্দ্বয়ঞ্চৈক্যমাপ্তম্" হইতে হইয়াছে, শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণ এই দুই মিলিয়া এক হইতে হইয়াছে, "রসরাজ মহাভাব দু'য়ে একরূপ" হইতে হইয়াছে; শ্রীরাধার প্রতি গৌর অঙ্গদ্বারা স্বীয় প্রতি শ্যাম অঙ্গে নিবিড়তম ভাবে আলিঙ্গিত হইয়া শ্যামসুন্দরকে গৌরসুন্দর হইতে হইয়াছে; শ্রীপাদ জীবগোস্বামীর কথায়, "অন্তঃকৃষ্ণ বহির্গৌর" হইতে হইয়াছে এবং শ্রীমদ্ভাগবতের কথায় "কৃষ্ণবর্ণ ত্বিষাকৃষ্ণ" হইতে হইয়াছে। ইহাই শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের স্বরূপ এবং মাদনাখ্য-মহাভাবই তাঁহার স্বরূপগত ভাব—তিনি স্বরূপে মাদনের আশ্রয়। তাঁহার মধ্যে মাদনের বিকাশেই তাঁহার স্বরূপের পূর্ণ বিকাশ। মাদনের বিকাশ হয় মিলনে—শ্রীকৃষ্ণের সহিত শ্রীরাধার মিলনে। এই মিলন যত নিবিড় হইবে, মাদনের উচ্ছ্বাসও ততই আধিক্য ধারণ করিবে। শ্রীশ্রীগৌরস্বরূপে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের নিবিড়তম মিলন। আবার প্রেম-বিলাস-বিবর্ত্তেই শ্রীরাধার সহিত শ্রীকৃষ্ণের নিবিড়তম মিলন এবং মাদনের চরমতম বিকাশ। সুতরাং শ্রীরাধার প্রেম-বিলাস-বিবর্ত্তের ভাবে শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর যখন আবিষ্ট হয়েন, তখন তাঁহার মধ্যেও মাদনের পূর্ণতম বিকাশ লক্ষিত হইবে। এজন্যই ২।৮।১৫৬ পয়ারের টীকায় শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরকে প্রেম-বিলাস-বিবর্ত্তের মূর্ত্ত বিগ্রহ বলা হইয়াছে। ইহাই গৌরের স্বরূপ; যেহেতু, এই বিগ্রহেই শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ-যুগলের নিবিড়তম মিলন এবং মাদনের সর্ব্বাতিশয়ী বিকাশ।

কিন্তু মধ্যলীলায় দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে এবং অন্ত্যলীলায় শ্রীমন্মহাপ্রভুর যে সমস্ত প্রলাপোক্তি দৃষ্ট হয়, তাহাদের প্রায় সমস্তই দিব্যোন্মাদ-জনিত প্রলাপ—শ্রীকৃষ্ণ-বিরহ-ক্লিষ্টা শ্রীরাধার ভাবের আবেশে প্রভুর শ্রীমুখ হইতে উৎসারিত প্রলাপ। এ সমস্ত প্রলাপের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া বলিতে গেলে প্রভুকে শ্রীকৃষ্ণ-বিরহের বা বিপ্রলম্ভের মূর্ত্ত বিগ্রহই বলা যায়; কেহ কেহ তাহা বলিয়াও থাকেন। কিন্তু প্রভুর এই বিপ্রলম্ভ-বিগ্রহকে তাঁহার স্বরূপের বিগ্রহ বলা সঙ্গত বলিয়া মনে হয় না। কারণ, পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে—শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের নিত্য নিবিড়তম মিলন এবং মাদনই প্রভুর স্বরূপগত ভাব। বিরহে মাদনের বিকাশ নাই, আছে মোহনের বিকাশ। মোহন প্রভুর স্বরূপগত মুখ্য ভাব নহে। অবশ্য যে মোদন বিরহে মোহন আখ্যা প্রাপ্ত হয়, মাদন স্বয়ং-প্রেম বলিয়া সেই মোদন মাদনেরই মধ্যে অন্তর্ভুক্ত; তথাপি কিন্তু মোদন এবং মাদন এক নহে; মোদন অপেক্ষা মাদনে প্রেমের এক অনির্ব্বচনীয় সর্ব্বাতিশায়ী বিকাশ; মাদন হইল সর্ব্বভাবোদ্গমোল্লাসী; মোদন কিন্তু তাহা নহে, মোহনও তাহা নহে। তাই মোহন-সম্ভূত দিব্যোন্মাদের বিগ্রহকে মাদন-সম্ভূত প্রেম-বিলাস-বিবর্ত্তের বিগ্রহের সঙ্গে অভিন্ন বলা সঙ্গত হয় না। মাদনাখ্য-মহাভাববতী শ্রীরাধার মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের সহিত বিরহের অবস্থায় মোহন উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিলেই দিব্যোন্মাদ এবং তজ্জনিত প্রলাপাদির অভ্যুদয় হয়। তখন তাঁহার মাদন থাকে স্তম্ভিত বা প্রচ্ছন্ন হইয়া; কারণ, মিলনেই মাদনের উল্লাস। "রসরাজ মহাভাব দুইয়ে একরূপ" গৌরও যখন শ্রীরাধার মোহনাখ্য-ভাবের আবেশ প্রাপ্ত হয়েন, তখন তাঁহার মধ্যেও তাঁহার স্বরূপগত-মুখ্যভাব মাদন থাকে স্তম্ভিত বা প্রচ্ছন্ন হইয়া। মোহন যেমন মাদনাখ্য-মহাভাববতী শ্রীরাধার স্বরূপগত সর্ব্বপ্রধান ভাব নহে, রাধাভাবাবিষ্ট গৌরেরও তাহা স্বরূপগত সর্ব্বপ্রধান ভাব নহে।

মধ্যলীলার অষ্টম পরিচ্ছেদে উদ্ধৃত প্রেমবিলাস-বিবর্ত্ত-দ্যোতক "পহিলহি রাগ নয়ন ভঙ্গ ভেল" ইত্যাদি যে গানটী রায়-রামানন্দ কর্ত্তৃক গীত হইয়াছিল, তাহার "ন সো রমণ ন হাম রমণী। দুহু মন মনোভব পেশল জানি।"-ইত্যাদি অংশেই প্রেমবিলাস-বিবর্ত্ত-সূচিত হইয়াছে (মিলনেই ইহা সম্ভব); পরবর্ত্তী "অব সোই বিরাগ" ইত্যাদি অংশে শ্রীকৃষ্ণের সহিত শ্রীরাধার বিরহের কথাই বলা হইয়াছে; এই অংশে প্রেম-বিলাস-বিবর্ত্ত সূচিত হয় নাই। যেহেতু, বিরহে বিলাসই সম্ভব নয়। উক্ত গানে প্রেমবিলাস-বিবর্ত্তের কথাতে শ্রীরাধার প্রেম-মহিমার চরমতম

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

পরাকাষ্ঠার কথা বলিয়া তাহার পরে তাঁহার বিরহের কথা বলা হইয়াছে; প্রেমবিলাস-বিবর্ত্তেই শ্রীরাধা-প্রেম মহিমার পরাকাষ্ঠা, বিরহে নহে; তথাপি বিরহও তাঁহার প্রেম-মহিমার যে এক অপূর্ব্ব বৈচিত্রী, তাহা অস্বীকার করা যায় না। তদ্রূপ, রাধাভাবাবিষ্ট প্রভুর দিব্যোন্মাদও প্রেমবিলাস-বিবর্ত্ত-বিগ্রহ-শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের এক অপূর্ব্ব ভাববৈচিত্রী; বিপ্রলম্ভ-বিগ্রহ গৌরও প্রেমবিলাস-বিবর্ত্ত-বিগ্রহ গৌরের এক অপূর্ব্ব প্রকাশ—ইহা তাঁহার স্বরূপ নহে।

যদি কেহ প্রশ্ন করেন যে, শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর যখন শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের নিত্য মিলিত স্বরূপ, তখন তাঁহাতে বিরহের ভাব কিরূপে উদিত হইতে পারে? উত্তরে বলা যায়—ইহা অসম্ভব নয়; প্রেম-বৈচিত্ত্যের উদয়ে শ্রীকৃষ্ণের অঙ্কস্থিতা শ্রীরাধার মধ্যেও বিরহের ভাব উদিত হইয়া থাকে। শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর-রূপে শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার প্রেমের মহিমাও অনুভব করিতেছেন; দিব্যোন্মাদে প্রেমের যে মহিমা অভিব্যক্ত হয়, তাহার আস্বাদন না করিলে তাঁহার রাধাপ্রেম-মহিমা জানার বাসনাই যে অন্ততঃ আংশিকভাবে অপূর্ণ থাকিয়া যাইবে।

ব্রজলীলায় শ্রীকৃষ্ণের তিনটী অপূর্ণ বাসনার মধ্যে একটী হইতেছে শ্রীরাধার প্রণয়-মহিমা জানিবার বাসনা; শ্রীরাধায়াঃ প্রণয়-মহিমা কীদৃশো বা। নানা ভাবে প্রভুর এই বাসনাটী পূর্ণ হইয়াছে। রায় রামানন্দের সঙ্গে সাধ্য-তত্ত্ব আলোচনার ব্যপদেশে প্রভু রায়ের মুখে শ্রীরাধাপ্রেমের মহিমাই খ্যাপন করাইয়াছেন; ইহাতেই শ্রীরাধাপ্রেম-মহিমার এক বৈচিত্রী উদ্‌ঘাটিত করাইয়া প্রভু তাহা আস্বাদন করিয়াছেন; তাহাতে মহিমার এক বৈচিত্রী জানিবার বাসনাও পূর্ণ হইয়াছে। রায়-রামানন্দের সঙ্গে এই সাধ্য-তত্ত্বের আলোচনা-প্রসঙ্গে যে প্রেমবিলাস-বিবর্ত্তের কথা উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে, তাহাতে প্রেমবিলাস-বিবর্ত্তের ভাবে আবিষ্ট হইয়া "রসরাজ মহাভাব দুইয়ে একরূপ"-গৌরসুন্দর শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের বিলাস-মাধুর্য্যের চরমতম পরাকাষ্ঠা আস্বাদন করিয়া বিহ্বল হইয়া পড়িয়াছেন; ইহাতে শ্রীকৃষ্ণ-মাধুর্য্যের আস্বাদনের জন্য ব্রজলীলায় তাঁহার যে এক অপূর্ণ বাসনা ছিল, তাহাও পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছে। অবশ্য ইহা মাধুর্য্য আস্বাদনের একটী বৈচিত্রী মাত্র। অন্ত্যলীলার চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদোক্ত রাসলীলার স্বপ্নদর্শনে "ত্রিভঙ্গ-সুন্দর দেহ মুরলীবদন। পীতাম্বর বনমালা মদনমোহন॥ ৩।১৪।১৬॥"-স্বরূপের দর্শনে প্রভু শ্রীকৃষ্ণ-মাধুর্য্যের আর এক বৈচিত্রী আস্বাদন করিয়াছেন। আবার জগন্নাথ-মন্দিরে প্রভু যখন "জগন্নাথে দেখে সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্র-নন্দন। ৩।১৫।৬॥" এবং এই দর্শন মাত্রেই যখন "একিবারে স্ফুরে প্রভুর কৃষ্ণের পঞ্চগুণ। পঞ্চগুণে করে পঞ্চেন্দ্রিয় আকর্ষণ॥ ৩।১৫।৭॥", তখনও প্রভু শ্রীকৃষ্ণ-মাধুর্য্যের আর এক বৈচিত্রীর আস্বাদন পাইয়াছেন; অন্ত্য ষোড়শ পরিচ্ছেদোক্ত "সুকৃতিলভ্য ফেলালব"-প্রাপ্তিতে প্রেমের আশ্রয়রূপে প্রভু শ্রীকৃষ্ণাধরামৃতের মাধুর্য্যও আস্বাদন করিয়াছেন। অন্ত্য অষ্টাদশ পরিচ্ছেদোক্ত রাসান্তে জলকেলির দর্শনেও প্রভু শ্রীকৃষ্ণ-মাধুর্য্যের আর এক বৈচিত্রীর আস্বাদন করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্য বলিতে কেবল রূপ-মাধুর্য্যই বুঝায় না, শ্রীকৃষ্ণের নাম, রূপ, গুণ, লীলা-আদির সকল রকম মাধুর্য্য-বৈচিত্রীই বুঝায়। এই সমস্ত শ্রীরাধিকা যে ভাবে আস্বাদন করেন, সেই ভাবে আস্বাদনের জন্যই ব্রজলীলায় শ্রীকৃষ্ণের বলবতী লালসা। শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ-মিলিত বিগ্রহরূপে প্রভু তাহা আস্বাদন করিয়াছেন। অন্ত্যলীলার বিংশ পরিচ্ছেদের শেষ ভাগে শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী বলিয়া গিয়াছেন—তিনি প্রভুর সমস্ত লীলা বর্ণন করিতে পারেন নাই; দিগ্‌দর্শনরূপে কয়েকটী লীলামাত্র বর্ণন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। আরও লিখিয়াছেন "আমি অতি ক্ষুদ্রজীব পক্ষী রাঙ্গাটুনি। সে যৈছে তৃষ্ণায় পিয়ে সমুদ্রের পাণি॥ তৈছে আমি এক কণ ছুঁইল লীলার। এই দৃষ্টান্তে জানিহ প্রভুর লীলার বিস্তার॥ ৩।২০।৮১-২॥" কবিরাজ গোস্বামীর বর্ণিত এবং অবর্ণিত বহু লীলাতেই প্রভু শ্রীকৃষ্ণ-মাধুর্য্য আস্বাদন করিয়াছেন। শ্রীরাধার ন্যায় শ্রীকৃষ্ণ-মাধুর্য্যের আস্বাদন কেবলমাত্র মাদনাখ্য-মহাভাবের প্রভাবেই সম্ভব। এই মাদনের সহায়তাতেই প্রভু এই সমস্ত লীলায় শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্য আস্বাদন করিয়াছেন এবং এই আস্বাদনের ব্যপদেশে স্বীয় মাধুর্য্যের স্বরূপ এবং এই মাধুর্য্য আস্বাদন করিয়া শ্রীরাধা যে সুখ পাইয়া থাকেন, সেই সুখের স্বরূপও অবগত হইয়াছেন। এইরূপে "অনয়ৈবাস্বাদ্যো যেনাদ্ভুতমধুরিমা কীদৃশো বা মদীয়ঃ। সৌখ্যঞ্চাস্যা মদনুভবতঃ কীদৃশং বা"-এই বাসনাদ্বয়েরও পরিপূরণ করিয়াছেন। শ্রীরাধা যেমন মাদনঘন-বিগ্রহা, তদ্রূপ এই

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

আস্বাদনেও "রসরাজ মহাভাব দুইয়ে একরূপ" গৌরও মাদনঘন-বিগ্রহ। এই আস্বাদনেই গৌরের নিজস্ব স্বরূপের পরিচয় পাওয়া যায়।

রাসলীলা, জলকেলি-আদির দর্শনের সময়ে প্রভু দূরে থাকিয়াই এসকল লীলা দর্শন করিয়াছেন বলিয়া কবিরাজ গোস্বামী বর্ণন করিয়াছেন। কিন্তু দূরে থাকিয়া দর্শন করিলেও—সুতরাং দর্শন-কালে প্রভু অন্য গোপীর ভাবে আবিষ্ট ছিলেন বলিয়া মনে হইলেও—প্রভুতে তখনও মাদনের আবির্ভাবই ছিল; যেহেতু, মাদন হইতেছে প্রভুর স্বরূপগত ভাব। ৩।১৪।১৬-১৭-পয়ারের টীকায় "অন্য গোপীভাবে প্রভুর বৈশিষ্ট্য"-অংশ দ্রষ্টব্য।

তারপর দিব্যোন্মাদের কথা। মোহনের অভ্যুদয়েই দিব্যোন্মাদ হয়—ইহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। বৃন্দাবনেশ্বরী শ্রীরাধিকাতেই এই মোহন ভাব প্রকাশ পায়। "দিব্যোন্মাদাদয়োঽপ্যস্থে বিদ্বদ্ভিরনুকীর্ত্তিতাঃ। প্রায়ো বৃন্দাবনেশ্বর্য্যাং মোহনোঽয়মুদঞ্চতি ॥ উঃ নীঃ স্থা, ১৩২ ॥" সুতরাং দিব্যোন্মাদের ভাবে আবিষ্ট শ্রীমন্মহাপ্রভুতেও শ্রীরাধারই ভাবের আবেশ; শ্রীরাধার ভাবের আবেশ বলিয়া ইহাও প্রভুর স্বরূপগত ভাবেরই আবেশ; স্বরূপগত ভাবের আবেশ হইলেও ইহা স্বরূপগত মুখ্য ভাবের—মাদনের—আবেশ নহে, ইহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। ইহা হইতেছে প্রভুর স্বরূপগত রাধাভাবের একটী বৈচিত্রী।

দিব্যোন্মাদে অসহ্য যন্ত্রণা থাকিলেও অনির্ব্বচনীয় রসমাধুর্য্যও আছে। "বাহ্যে বিষজ্বালা হয়, ভিতরে আনন্দময়, কৃষ্ণপ্রেমার অদ্ভুত চরিত ॥ ২।২।৪৪ ॥ পীড়াভির্নবকালকূট-কটুতা-গর্ব্বস্য নির্ব্বাসনো নিঃস্যন্দেন মুদাং সুধামধুরিমাহঙ্কার-সঙ্কোচনঃ। প্রেমা সুন্দরি নন্দনন্দনপরো জাগর্ত্তি যস্যান্তরে জ্ঞায়ন্তে স্ফুটমস্য বক্রমধুরাস্তেনৈব বিক্রান্তয়ঃ ॥ বিদগ্ধমাধব। ২।৩০ ॥" তাই, শ্রীরাধার দিব্যোন্মাদ-ভাবের আবেশেও প্রভু মাধুর্য্যের এক অদ্ভুত বৈচিত্রী আস্বাদন করিয়াছেন। মাধুর্য্যের আস্বাদন কেবল যে মিলনে হয়, তাহা নহে; বিরহেও মাধুর্য্যের আস্বাদন হইয়া থাকে।

প্রশ্ন হইতে পারে—শ্রীরাধার সুখের স্বরূপ জানিবার জন্যই ব্রজেন্দ্র-নন্দনের বাসনা; দুঃখের স্বরূপ জানিবার জন্য তো তাঁহার বাসনা জাগে নাই; তবে, বিষজ্বালাময় দিব্যোন্মাদের আবেশ প্রভুর কেন হইল?

ইহার উত্তর বোধহয়, এইরূপ। প্রথমতঃ, দুঃখই সুখকে মহীয়ান্ করিয়া তোলে। অম্ল যেমন মিষ্টবস্তুর মাধুর্য্যকে চমৎকারিতা দান করে, তদ্রূপ। তাই নিত্য-সম্ভোগময় মাদনেও বিরহের স্ফূর্ত্তি দেখা যায়। বিশেষতঃ, বিরহযন্ত্রণা প্রেমজনিত-আভ্যন্তরিক আনন্দকে কি এক অপূর্ব্ব অনির্ব্বচনীয় সুষমা দান করে, তাহা না জানিলে সেই সুখের স্বরূপও সম্যক্ জানা যায় না। দিব্যোন্মাদ-ভাবের আবেশে প্রভু যে উৎকট-দুঃখাবৃত পরমানন্দের অনুভব করিয়াছেন, শ্রীরাধাসুখের স্বরূপ জানিবার পক্ষে তাহাও অপরিহার্য্য।

দ্বিতীয়তঃ, শ্রীরাধার প্রেমের মহিমা অবগত হওয়ার পক্ষেও দিব্যোন্মাদের প্রয়োজন আছে। রাধাপ্রেমের একটা বৈচিত্রী প্রকাশিত হয় শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্য আস্বাদনে। রাসলীলা, জলকেলি-আদির স্ফুরণে সেই বৈচিত্রী প্রকাশিত হইয়াছে। প্রেমবিলাস-বিবর্ত্তেও তাহা প্রকটিত হইয়াছে। কিন্তু শ্রীরাধার প্রেম আশ্রয়ের উপরে কিরূপ প্রভাব বিস্তার করে, দিব্যোন্মাদাদিতেই তাহা জানা যায়। প্রেমের আশ্রয়ের উপরে এই প্রেমের কিরূপ বিষময় জ্বালা, দিব্যোন্মাদেই তাহা জানা যায়; ইহা না জানিলেও শ্রীরাধাপ্রেমের মহিমাজ্ঞান অপূর্ণ থাকিয়া যায়। তাই দিব্যোন্মাদের প্রয়োজনীয়তা।

রাধাপ্রেমের প্রভাবের আর একটী বৈচিত্রী প্রকাশিত হইয়াছে—প্রভুর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদির দীর্ঘীকরণে এবং প্রভুর কূর্ম্মাকৃতি-করণে। প্রভু স্বয়ংভগবান্ বলিয়া সর্ব্বশক্তিমান্ হইতে পারেন; কিন্তু রাধাপ্রেমের প্রভাবের নিকটে তাঁহার সর্ব্বশক্তিমত্তার গর্ব্বও খর্ব্বতা প্রাপ্ত হয় (৩।১৪।৬৩ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)।

এইরূপে দেখা গেল—দিব্যোন্মাদে প্রভুর শ্রীকৃষ্ণ-মাধুর্য্য-আস্বাদনের বাসনা, এবং রাধাপ্রেমের মহিমা অনুভবের বাসনা পূর্ত্তির আনুকূল্য হইয়াছে। তথাপি কিন্তু ইহা প্রভুর মুখ্য স্বরূপগত ভাব নহে; ইহার হেতু পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। তবে ইহা প্রভুর স্বরূপগত ভাবের বিরোধীও নহে, একদেশমাত্র।